বহলা গণহত্যা

আজহারুল আজাদ জুয়েল

১৯৭১
গণহত্যা ও নির্যাতন
আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ১৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
মুনতাসীর মামুন

সহযোগী সম্পাদক
মামুন সিদ্দিকী

প্রকাশকাল
চৈত্র ১৪২১/মার্চ ২০১৫

বহলা গণহত্যা [Bohala Genocide]

©
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
[1971 : Genocide-Torture Archive & Museum Trust]
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী
[Bangladesh History Congress]

প্রকাশক
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
৩৩৪ শের-এ-বাংলা রোড, ময়লাপোতা মোড়, খুলনা ৯১০০
itihassammilani.bd@gmail.com, archivemuseum1971@gmail.com
০১৮১৬২৮৮৬৭৪, ০১৭১৫৪৫৭৩৮২, ০১৭১১২১৭১১১

মুদ্রণ
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ, ৬০/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

গ্রন্থ নকশা ও প্রচ্ছদ
তারিক সুজাত

পরিবেশক
জার্নিম্যান বুকস্
সুবর্ণ

মূল্য : ১৪০ টাকা

ISBN : 978-984-91549-4-5

দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড প্রদত্ত অনুদানের
সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতন। একের অধিক মানুষ হত্যাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে গণহত্যা হিসেবে। নির্যাতনের অন্তর্গত শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করা। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং তা স্বাভাবিক। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনো একটি দেশে এতো অল্প সময়ে এতো হত্যাও হয়নি। যদিও আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছেন কিন্তু মনে হয় সংখ্যাটি তারও বেশি হবে। গণহত্যা, বধ্যভূমি, নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু গুরুত্ব ততোটা এর ওপর দেয়া হয়নি। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের ব্যাপারটি আড়ালে পড়ে যায়। কিন্তু ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা হয়েছিল তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রে এখনও সেই গণহত্যার কথা ফিরে আসে। যে কারণে ইউরোপে ফ্যাসীবাদ আর নাজিবাদ জায়গা করে নিতে পারেনি। আমাদের এখানে তা হয়নি দেখে গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে এখনও অনেকে প্রশ্ন করার সাহস রাখেন এবং হত্যাকারীদের সমাজ ও রাজনীতিতে এমনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে তারা একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশে সামরিকবাদ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আবারও শেকড় গেড়েছে।

এ দেশে গণহত্যা-নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ থেকেই মূলত এসব বাহিনীতে গেছে কর্মিরা। সুখের বিষয়, এসব মানবতা-বিরোধীদের বিচার শুরু হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে।

দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। নির্যাতনের শিকার বহু নারী-পুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনকী নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায়, অনুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসন্ধানে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরি আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসার পাশাপাশি উত্তরপ্রজন্মের মাঝে মুক্তিসংগ্রামের মর্মবাণী প্রতিভাত হবে। এই তাগিদ থেকে গড়ে ওঠেছে '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট'। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের বাণী প্রচার করা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ।

এরই আলোকে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত গণহত্যা ও বধ্যভূমির ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি গণহত্যার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা'র উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি পুস্তিকা লেখকের স্বকীয়তা বজায় রেখেও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হবে। এর বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহীদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। প্রতিবেদনধর্মী হলেও পুরো কাজটি গবেষণামূলক। উল্লেখ্য, গণহত্যায় সব শহীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে প্রতিটি গণহত্যায় যে কজনের নাম পাওয়া গেছে শুধু তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থে অনেক আলোকচিত্র/শিল্পীদের চিত্রকর্মের প্রতিলিপি ব্যবহার করা হয়েছে যা নেয়া হয়েছে অন্তর্জাল ও বিভিন্ন বই থেকে। মুক্তিযুদ্ধের ছবি যেহেতু জনস্বার্থে ব্যবহৃত হয় সে জন্য কখনও কেউ আপত্তি তোলেননি। শিল্পী ও আলোকচিত্রিদের ঋণ আমরা স্বীকার করছি।

এ কাজের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, লেখক গণহত্যা ও বধ্যভূমি স্থলে সরেজমিনে গিয়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে, গণহত্যা সংশ্লিষ্টজনের সঙ্গে কথা বলে, পর্যবেক্ষণ করে– সেই অশ্রু-শোণিতের দিনগুলিকে অন্তরে অনুভব করে তবেই প্রণয়ন করেছেন এই ভাষ্য। সবার হৃদয় নিংড়ানো কথামালা যেন এখানে মেলে ধরেছে ভয়াল দিনের স্মৃতি। ফলে এর মধ্য দিয়ে যে সেই গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অকৃত্রিমরূপে উঠে এসেছে– এ ভরসা আমরা করি।

বর্তমান পুস্তিকা *বহলা গণহত্যায়* দিনাজপুর জেলা শহরের পুনর্ভবা নদী সংলগ্ন বিরল উপজেলার বিজোড়া ইউনিয়নাধীন বহলা গ্রামে সংঘটিত গণহত্যা-নির্যাতনের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধের গবেষক আজহারুল আজাদ জুয়েল। নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেও তিনি বহলা গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। আমাদের এই প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি ও গণকবর সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় এ গ্রন্থমালা বিশেষ আলো ফেলবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে শুধু গৌরব নয়, মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবিধূর কাহিনী তুলে ধরতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উঠে আসবে। এই বেদনা ও গৌরবের কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে মানবতার জয়গান করে সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শও তো তাই।

মুনতাসীর মামুন
গ্রন্থমালা সম্পাদক

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর জেলায় অনেক গণহত্যার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে বিরলের বহলা এবং নবাবগঞ্জের চড়ারহাটে সংঘটিত গণহত্যা সর্বাধিক পরিচিত। বহলা গণহত্যায় ৪২ জন শহীদের নাম পাওয়া গেছে। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের কারো কারো মতে এখানে নিহতের সংখ্যা ৬০-৬৫ জনের কম নয়।

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো হত্যা-নির্যাতনের গতি-প্রকৃতি বহলাতে অনেকটা একই রকম। কিছুটা মিল যেমন আছে, কিছুটা ব্যতিক্রমও। অন্যান্য স্থানে দলবদ্ধভাবে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে লুট, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যা-নির্যাতন শেষে ধর্ষণ দিয়ে শেষ হয়েছে অপারেশন। কিন্তু এখানে হিন্দু নয়, হত্যা করা হয়েছে মুসলমানদের। গণহত্যার সাথে পাকিস্তানি বাহিনী এবং আলবদর বাহিনী সরাসরি জড়িত ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বহলা গণহত্যা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে উঠে আসেনি। আঞ্চলিক লেখক-সাংবাদিকেরা এই গণহত্যা নিয়ে কিছু লেখালেখি করলেও তাতে বিস্তারিত তথ্য ছিল না। দিনাজপুরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশ ক'টি বই ও স্মরণিকা হলেও সেই সব বই ও স্মরণিকায় বহলা গণহত্যা সহ দিনাজপুরের কোনো গণহত্যার ঘটনা যথাযথভাবে উঠে আসেনি।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার অবদান বইয়ে বহলা গণহত্যার বিষয়টি *হত্যা: গণহত্যা : নির্যাতন* শিরোনামের একটি অধ্যায়ে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরা হলেও বিস্তারিত তথ্য ছিল না। ৫-৭টি বাক্যে একটুখানি বিবরণ দিয়ে শহীদদের তালিকা তুলে ধরা হয়েছিল ঐ লেখায়। ২-১টি বইয়ে বহলা গণহত্যাকে তুলে ধরা হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। কোনো কোনো বইয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে নির্যাতিতদের সাক্ষাৎকার আছে। কিন্তু এই সব বইয়ে বহলা গণহত্যায় নির্যাতিতদের কারো সাক্ষাৎকার ছিল না।

১৯৯৬ সালে বিজয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে দিনাজপুর জেলা প্রশাসন *বিজয়ের ২৫ বছর* নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে। তৎকালীন জেলা প্রশাসক আজিজুর রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত স্মরণিকায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি তালিকা প্রকাশ করা

হলেও বহলা গণহত্যায় শহীদদের তালিকা তাতে ছিল না। বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই ও স্মরণিকায় বরাবরই বহলা অনেকটা উপেক্ষিত হয়েছে।

তবে বর্তমান গ্রন্থে বহলা গণহত্যার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। গণহত্যার শিকার শহীদ পরিবার, নির্যাতিত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই-পুস্তক থেকে খুঁটিনাটি তথ্য তুলে আনার চেষ্টা করেছি। তারপরেও হয়তো অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। তবে বিশ্বাস করি যে, ভবিষ্যতে সেই অসম্পূর্ণতা অন্য কেউ পূরণ করতে এগিয়ে আসবেন। মুক্তিযুদ্ধের অনুপুঙ্খ ইতিহাস– ঘটনাপ্রবাহ, তথ্য-মাত্রা ইত্যাদির সমষ্টি এখনও বহুদূর। আঞ্চলিকভাবে, প্রয়োজনে গ্রামকে একক হিসেবে গ্রহণ করে এর চর্চা করা গেলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পূর্ণতা পেতে পারে।

'১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা' প্রকল্পের জন্য বহলা গণহত্যার তথ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে মানুষের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছি। আবার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাদের হতাশা দেখে ব্যথাও পেয়েছি। এখানকার শহীদ পরিবার এবং নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর বেশিরভাগ দরিদ্র। তারা সরকারি কোনো সহযোগিতা পান না। তাদের সন্তানদের চাকুরিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দরকার। বয়স্ক লোকদের দরকার বয়স্ক ভাতা। দরিদ্রদের দরকার ভিজিএফ কার্ড ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু শহীদ পরিবার হলেও তারা কোনো সুবিধা তারা পান না।

বহলা গণহত্যার তথ্য সংগ্রহকালে চেষ্টা করেছি ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য গ্রহণ করতে। শহীদ পরিবার ও নির্যাতিত ব্যক্তি যাদের সাথেই কথা বলেছি, তাদের ছবি নিয়েছি। তবে শহীদদের ছবি পাইনি। মুক্তিযুদ্ধ যে সময়ে হয়েছিল তখন শুধু গ্রামের মানুষ নয়, শহরের লোকেরাও ছবি কম তুলতেন। ছবি যদি কেউ তুলেছিলেন বলে ধরেও নেই তাহলেও গ্রামীণ আবহে এতগুলো বছর ধরে তা সংরক্ষণ করা কোনো পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে কোনো শহীদের ছবি সংগ্রহ করতে না পারার অপূর্ণতা রয়ে গেল।

কাজের সূত্রে বহলা যতবার গিয়েছি, বহলাবাসীর আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছি। এ ব্যাপারে বহলা গণহত্যার শিকার শহীদ আব্দুস সাত্তারের পুত্র এবং দিনাজপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিজম

বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক সৈয়দুর রহমান তুষার সর্বক্ষণ সাথে থেকে সহায়তা করেছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। যারা সাক্ষাৎকার, তথ্য ও তাদের ছবি তুলতে দিয়ে সহায়তা দিয়েছেন আমার কৃতজ্ঞতা তাদের কাছেও।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষক মামুন সিদ্দিকীর প্রতি। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই এই বইটি লেখার কাজ শুরু করেছিলাম। কীভাবে কাজটি করতে হবে তার পদ্ধতিও তিনি বলে দিয়েছিলেন। তথ্যসংগ্রহের কাজ করতে গিয়ে একদিন সঙ্গে পেয়েছিলাম পরিবেশ বিষয়ক গবেষক পাভেল পার্থকে। সেদিন আমার সাথে থেকে তিনিও বহলা গণহত্যায় নির্যাতিতদের অনেকের সাথে কথা বলেন এবং তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেন। কৃতজ্ঞতা থাকল তাদের প্রতিও।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত এ গ্রন্থমালা বিদ্বৎসমাজে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এই গুণী ব্যক্তির প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

ফাল্গুন ১৪২১/ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আজহারুল আজাদ জুয়েল
a.azadjewel@gmail.com

ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা দিনাজপুর। বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম সভ্যতার বহু কীর্তিতে সমৃদ্ধ এই জেলা। প্রাচীন কোটিবর্ষ এবং পঞ্চনগরীর সমন্বয়ে গঠিত জেলা দিনাজপুর। অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের। ঐতিহাসিক যুগে এই জেলার উত্তর অংশ প্রাগজ্যোতিষ রাজ্য পরে কামরুপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এরপর কালক্রমে গুপ্ত, পাল, সেন, মোগল ও ইংরেজদের হাতে শাসিত হয় দিনাজপুর জনপদ।

দিনাজপুর শহর সংলগ্ন পুনর্ভবা নদীর উপর রেল সেতু। দিনাজপুর শহর হতে এই সেতুপার হলেই বহলা। পাকিস্তানি বাহিনী ও আলবদরেরা এই সেতু দিয়ে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো ট্রেনে চড়ে বহলা, বিরল যাতায়াত করতো

১৭৮৬ সালে দিনাজপুর জেলা গঠন করা হয়। বর্তমান ভারতের বালুরঘাট, পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর, বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ব্রিটিশ শাসনামলে দিনাজপুর জেলার অংশ ছিল। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক কারণে দিনাজপুরের ভৌগোলিক আয়তনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে বর্তমান ঠাকুরগাঁওয়ের ৫টি ও পঞ্চগড়ের ৬টি উপজেলাসহ দিনাজপুরের উপজেলা (থানা) ছিল ২৩। কিন্তু ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়কে আলাদা জেলা ঘোষণার পর বর্তমান দিনাজপুরে উপজেলার সংখ্যা ২৩ থেকে কমে গেয়ে ১৩ দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে এই জেলার আয়তন ৩৪৩৭.৯৮ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ৩৩ লাখ। বিরল দিনাজপুরের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। বহলা বিরল উপজেলারই একটি বধ্যভূমি, যেখানে প্রায় ৪২ জনেরও অধিক নিরীহ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত মুজিবনগর সরকারের ইশতেহার পাঠ করেছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। তিনি বিরল উপজেলার কৃতী সন্তান। বিরল সহ ৪ থানা নিয়ে গঠিত সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিরলের ফরক্কাবাদে তাঁর বাড়ি। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদান ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে।

বিরল দিনাজপুর জেলা শহরের সবচেয়ে কাছের উপজেলা। দিনাজপুর জেলা শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে যাওয়া পুনর্ভবা নদীর পশ্চিম তীরে এর অবস্থান। নদীর পূর্ব তীরে দিনাজপুর জেলা শহর।

পুনর্ভবা নদীর এই সেতু পেরিয়ে সোজা গেলে বিরল, বাঁয়ে গেলে বহলা। মুক্তিযুদ্ধের পর এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে ছিল কাঞ্চনঘাটা। নৌকায় এই ঘাট দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও আলবদরেরা বিরল, বহলায় যাতায়াত করতো।

দিনাজপুরে বাঙালিদের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল ২৪ মার্চ থেকে। সারা দেশে বাঙালিদের বিরুদ্ধে অবাঙালি ও পাকিস্তানি সেনাদের যে অঘোষিত হত্যা-নির্যাতন চলছিল দিনাজপুরের সার্বিক পরিস্থিতি তার ব্যতিক্রম ছিল না। পাকিস্তানি বাহিনী ও বিহারীদের হামলা

প্রতিরোধ করতে গিয়ে দিনাজপুরের চিরিরন্দর উপজেলার (তৎকালীন থানা) একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাহতাব বেগ শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার কুঠিবাড়ি দখলের মাধ্যমে বাঙালিরা এই জেলায় প্রথমবারের মতো পাকিস্তানি সেনাদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়।

পাকিস্তানি বাহিনীর মূল ঘাঁটি ছিল কুঠিবাড়ি। এর ভেতরে থাকা ইপিআর-এর বাঙালি সৈনিকরা সুবেদার মেজর আব্দুর রবের নেতৃত্বে ২৮ মার্চ দুপুর ২টায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অবাঙালি সৈনিকদের উপর বেয়নেট চার্জের মাধ্যমে বিদ্রোহ করে। সাধারণ মানুষও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বিদ্রোহে ছক মোতাবেক সহযোগিতা করেন।

দিনাজপুর জেলা শহরসহ বিরল ও বোচাগঞ্জের হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষ কুঠিবাড়ি দখল করার লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেন। জেলা সদর হতে নির্বাচিত এমএনএ এম আব্দুর রহিম, বোচাগঞ্জের রাজনৈতিক নেতা আব্দুর রৌফ চৌধুরীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব কুঠিবাড়ি দখলে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাঙালি সৈনিকরা সেক্টরের অস্ত্রাগার দখল ও লুট এবং হাজার হাজার সাধারণ মানুষের সহায়তায় সেগুলো বের করে আনেন। পরে ঐ অস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। কুঠিবাড়ি দখলের যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাদের কয়েকজন অফিসারসহ অনেক সৈনিক এই যুদ্ধে মারা যায়। বিহারীরা এ সময় কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

ইপিআর সেক্টর কার্যালয় বা কুঠিবাড়ি দখলের মাধ্যমে ২৮ মার্চ হতে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত দিনাজপুর জেলা মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। এই সময় বাঙালিদের শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনা বেড়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলায় বাঙালি সৈনিক ও সাধারণ মানুষ দিনাজপুর জেলার মোহনপুর, দশমাইল, ভূষিরবন্দর, রানীরবন্দর, চম্পাতলীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে।

এপ্রিলের ৫-৬ তারিখ হতে পাকিস্তানি বাহিনী নীলফামারীর সৈয়দপুর-রানীরবন্দর-দশমাইল হয়ে দিনাজপুর, ফুলবাড়ী-আমবাড়ী মোহনপুর হয়ে দিনাজপুর এবং বদরগঞ্জ-পার্ব্বতীপুর-চিরিরবন্দর হয়ে দিনাজপুরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। বাঙালিরা চম্পাতলী, রানীরবন্দর, ভূষিরবন্দর, দশমাইল, ফুলবাড়ি, আমবাড়ী, আমতলী, মোহনপুরসহ বিভিন্ন পয়েন্টে তাদেরকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্রের সামনে সেই প্রতিরোধ ভেঙে যেতে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনী ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় দিনাজপুর জেলা শহরের কাছাকাছি চলে এলে দিনাজপুর শহরসহ সদরের বাঙালি জনগোষ্ঠী এবং

মুক্তিযোদ্ধারা পুনর্ভবা নদী পেরিয়ে বিরলের দিকে অথবা সদরের কমলপুর, খানপুর এলাকায় ভারতীয় সীমান্তের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। অনেকে ভারতেও পালিয়ে যায়। ১৪ এপ্রিল সকাল হওয়ার আগেই পাকিস্তানি সেনাদের হাতে দিনাজপুর শহরের পতন হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা প্রত্যন্ত এলাকায়ও ঢুকে পড়তে সমর্থ হয়।

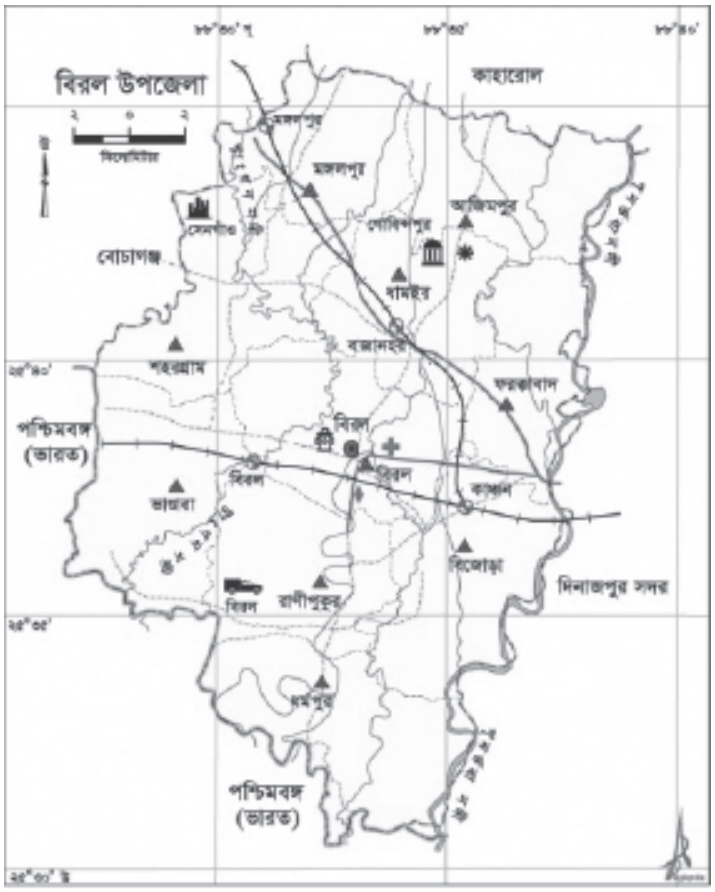

বিরল উপজেলার মানচিত্র *সৌজন্যে বাংলাপিডিয়া*

স্থানটির তৎকালীন অবস্থা

বিরল সীমান্তবর্তী উপজেলা। পুনর্ভবা নদীর পশ্চিম প্রান্তে এর অবস্থান। বিরলের পূর্ব-উত্তরে কাহারোল, উত্তরে বোচাগঞ্জ এবং পশ্চিমে ভারত এর অবস্থান। ১টি পৌরসভা এবং ১০টি ইউনিয়ন নিয়ে বর্তমান বিরলের প্রশাসনিক কাঠামো গঠিত। তবে একাত্তরে এটি ১০টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। ইউনিয়নগুলির নাম: আজিমপুর, ফরক্কাবাদ, ধামইর, শহরগ্রাম, বিরল, ভান্ডারা, বিজোড়া, ধর্মপুর, মঙ্গলপুর, রানীপুকুর। বহলা বধ্যভূমি বিজোড়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এর দুই অংশ। উত্তর বহলা ও দক্ষিণ বহলা। উত্তর বহলায় আছে সাঁতাহার, পালশাহার, মোল্লাপাড়া নামের ৩টি পাড়া। কাঞ্চন রেলওয়ে জংশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাটি তখনো ছিল এবং এখনো রয়েছে উত্তর বহলায়। দক্ষিণ বহলায় রয়েছে পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া এবং ছোট হিন্দুপাড়া ও বড় হিন্দুপাড়া নামের আলাদা ৪টি পাড়া। এই ৪ পাড়া সাধারণভাবে 'বহলা' নামে পরিচিত। তবে উত্তর, দক্ষিণ মিলিয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় বহলা।

বহলার পশ্চিমে ধামাহার, বল্লভপুর, বিজোড়া, পূর্বে শ্রীকৃষ্ণপুর, কোকইডাঙ্গা, উত্তরে দোগাছী, ভবানীপুর, খোসালডাঙ্গি এবং দক্ষিণে মানপুর, রসুল সাহাপুর, আমিলাডাঙ্গী, খয়েরবনের অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধের সময় উত্তর বহলার সাঁতাহার পাড়ায় পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনে বিরল এলাকায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রফেসর ইউসুফ আলী, কছিমুদ্দিন আহমেদ শুকু প্রমুখ। বহলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন কলিমউদ্দিন, রমজান আলী, আফসার আলী, জবেদ আলী, আহমেদ হোসেন, হাফিজউদ্দীন প্রমুখ। তখন গ্রামীণ আবহের মধ্যেও বহলাসহ বিরলের মানুষ রাজনীতি সচেতন এবং সকলেই আওয়ামী লীগ সমর্থক ছিলেন।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ

একাত্তরে বহলা ছিল প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদ। ধান উৎপাদনের অনুকূল আবাদী জমি, বসত বাড়িগুলোতে মাটির ভিত, মাটির কাঠামো এবং খরের ছাওয়া চালা, চালার নিচে বাঁশ-বাতার তালা, বর্ষায় জল-কাদা, হাঁটার অনুপযোগী কাঁচা ও আইলের রাস্তা। সাদামাটা গ্রামীণ পরিবেশ বলতে যা বোঝায় একাত্তরে বহলা সে রকমটিই ছিল। সেখানে তখন পাকা সড়ক তো দূরের কথা ভালো একটা মেঠো পথও ছিল না। আইলের উপর দিয়ে লোকজনের যাতায়াত ছিল তখনকার জীবনযাত্রার স্বাভাবিকচিত্র।

গণহত্যার পটভূমি

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সময় থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর ২৬তম এফএফ (ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি ব্যাপক সামরিক সম্ভার নিয়ে দিনাজপুর সার্কিট হাউসে অবস্থান করছিল। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর দিনাজপুর জেলায় পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক তৎপরতার পাশাপাশি এক ধরনের গোপন প্রস্তুতি চালানো হচ্ছিল। গোপন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১৭ মার্চ দুই কোম্পানি ফার্স্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট দিনাজপুরে এসে পৌঁছায়। তারাও দিনাজপুর সার্কিট হাউসে ছাউনি ফেলে এবং বাঙালিবিরোধী তৎপরতা শুরু করে। সার্কিট হাউসের পেছন দিকে কুঠিবাড়িতে ছিল তৎকালীন ইপিআর বাহিনীর ৫ নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার। এটা দিনাজপুর সেক্টর হেডকোয়ার্টার নামে পরিচিত। এই সেক্টরের উইং ছিল ৩টি। উইংগুলির অবস্থান দিনাজপুরে ৮ নং উইং, ঠাকুগাঁওয়ে ৯ নং উইং ও রংপুরে ১০ নং উইং।

দিনাজপুর সেক্টরের অধিনায়ক ও উপ-অধিনায়ক ছিলেন ২ জন পশ্চিম পাকিস্তানি লেঃ কর্ণেল তারেক রাসুল কোরাইশি এবং মেজর তারেক আমিন। তারেক আমিন ৮ নং উইং-এর অধিনায়কও। তিনি ৯ মার্চ ৮ নং উইং অস্ত্রাগারের বাঙালি গার্ড পরিবর্তন করে পাঞ্জাবি ও পাঠান সৈন্যদের মোতায়েন করেন। একই দিনে উইংয়ের সুবেদার মেজর আব্দুর রব সহ ৩ জন বাঙালি অফিসারের বাঙালি নিরাপত্তা প্রহরীর পরিবর্তে অবাঙালি জওয়ানকে প্রহরী নিয়োগ করেন। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণার পর ১৬তম এফএফ বাহিনীর মারণাস্ত্রসমূহের মুখ ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের দিকে ঘুরিয়ে বসানো হয়।

মেজর তারেক আমিন মার্চ মাসের মাঝামাঝি তার উইংয়ের আওতাধীন বিওপি (বর্ডার আউট পোস্ট) গুলো থেকে অবাঙালি ইপিআর জোয়ানদের সেক্টর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসতে শুরু করেন। একই সময়ে সেক্টর এ্যাডজুটেন্টের বাঙালি পদটি একজন অবাঙালি অফিসার দিয়ে পূরণ করেন। ১৭ মার্চ ক্যাপ্টেন নাজির অস্ত্রাগারের সমস্ত চাইনিজ আর্মস ও গ্রেনেড এফএফ বাহিনীর (ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) কাছে ১৮ মার্চের মধ্যে জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। এভাবে পাকিস্তানি সেনারা মার্চের শুরু থেকে বাঙালি সৈনিক ও জনগণের বিরুদ্ধে বহুমুখী তৎপরতা চালাতে থাকে এবং নির্যাতন হত্যা ও গণহত্যার পটভূমি তৈরি করে।

দিনাজপুর শহরের ঘাসিপাড়া, বাহাদুর বাজার, নিউটাউন, কাঞ্চন কলোনি ছিল বিহারি অধ্যুষিত। তাদের অপতৎপরতার কারণে এইসব মহল্লার আশেপাশে বসবাসরত বাঙালিরা ২০-২১ মার্চ থেকে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে রাত যাপন করতে থাকে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যার খবর এবং বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এমন খবর দিনাজপুরে ২৬ মার্চ সকালেই জানাজানি হয়ে যায়। ফলে এই জেলায় বাঙালিদের তীব্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। অপরদিকে নীলনকশা অনুযায়ী পাকিস্তানি সেনা ও বিহারিরা হামলা, অগ্নিসংযোগ, হত্যার ঘটনা সবখানেই ছড়িয়ে দিতে থাকে। এক পর্যায়ে বাঙালিরা দিনাজপুর শহর ছেড়ে প্রথমে গ্রামে, পরে ভারতে পালিয়ে যেতে থাকে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক উপাদানের মূল ভিত্তি ছিল সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে তারা ফায়দা লুটার চেষ্টা করে। দিনাজপুরের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার কারণে এখানে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার করে যে, আওয়ামী লীগের কর্মী এবং হিন্দুরা দেশের শত্রু। অবশ্যই তাদের খতম করা উচিত। কিন্তু এই প্রচারণা সামান্যই সফলতা পায়।

দিনাজপুরের মানুষ বরাবরই অসাম্প্রদায়িক ভাবধারায় লালিত। তাই সাম্প্রদায়িক প্রচারণা এই জেলায় বিশেষ- সুবিধা করতে পারেনি। যারা আগের থেকে জামায়াতসহ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এরকম গুটি কয়েক ব্যক্তি ছাড়া তাদের ঐ সাম্প্রদায়িক প্রচারণা খুব বেশি লোককে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়।

পাকিস্তানি বাহিনীর প্রথম পর্যায়ের আক্রমণের সময়টাতে গরম ছিল সবখানে। পুনর্ভবা নদীতে তখন যথেষ্ট পানি থাকত। নৌকা থাকায় রাজাকাররা সহজে নদী পার হয়ে ছুটে আসতে পারত। পুনর্ভবা নদীর রেল সেতুর উপর দিয়েও রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনী আসা যাওয়া করত। বর্তমানে দিনাজপুর শহর থেকে বিরল উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তে আসা যাওয়ার যে তিনটি পথ আছে সেই সব পথ দিয়ে তখনো যাওয়া-আসা করা যেত, তবে যাওয়া-আসার উপায়গুলি ছিল একটু ভিন্ন। বর্তমানে বিরলের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া-আসার পথগুলি হচ্ছে;

* রাজাপাড়া (প্রকৃতপক্ষে রাজাপোড়া) ঘাট দিয়ে নৌকায় পুনর্ভবা নদী পার হয়ে জুলিমুদিখানা-দেওয়ানদিঘী-বাজনাহার হয়ে ধুকুরঝারী হাট।

* রেল সেতুর উপর দিয়ে ট্রেনে কাঞ্চন জংশন হয়ে বিরল অথবা বাজনাহার।

* কাঞ্চন সেতু দিয়ে নৌকায় নদী পার হয়ে বিরল অথবা বাজনাহার।

একাত্তরেও এই তিন পথ ছিল। এখনকার মতো একাত্তরেও রাজাপাড়া ঘাট দিয়ে নৌকায় পুনর্ভবা নদী পাড়ি দিত লোকজন। বর্তমানে কাঞ্চন সেতু যেখানে রয়েছে একাত্তরে সেখান দিয়ে মানুষ নৌকায় পুনর্ভবা নদী পারাপার করত। এটা তখন কাঞ্চন ঘাট নামে পরিচিত ছিল। কাঞ্চন ঘাট দিয়ে পুনর্ভবা নদী পার হওয়ার পর দুইটি পথ দুইদিকে ভাগ হয়ে একটি বিরল থানা সদরের দিকে, অপরটি ধুকুরঝারী হাটের দিকে চলে গেছে। একাত্তরে ধুকুরঝারী হাট হয়ে সেতাবগঞ্জ যাওয়ার রাস্তা পাকা থাকলেও বিরলের রাস্তা ছিল কাঁচা।

পাকিস্তানি বাহিনী রেল এবং নৌকা সব পথেই দিনাজপুর হতে বিরলের বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করত। মে মাসের মধ্যে বিরলের প্রায় সব এলাকা তাদের দখলে চলে আসায় মুক্তিযোদ্ধাদের পিছিয়ে যেতে হয়।

পুনর্ভবা নদীর উপর রেল সেতু একটাই ছিল। এই সেতু দিয়ে তখন পাকিস্তানি সেনারা ট্রেনে পারাপার করার পাশাপাশি হেঁটেও পারাপার করত। রেল সেতুর পূর্ব প্রান্তে দিনাজপুর শহর, পশ্চিম প্রান্তের বাম দিকে দক্ষিণ বহলা এবং ডান দিকে কাঞ্চন। যদি সেতু থেকে রেলপথ ধরে সামনের দিকে সোজা কাঞ্চন জংশনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে পাওয়া যাবে উত্তর বহলা। আর রেল সেতু পার হয়ে গণির মোড় থেকে এক-দেড়শ' গজ এগিয়ে বাম দিকে গেলে পাওয়া যাবে দক্ষিণ বহলা। রেল সেতু থেকে উত্তর বহলার দূরত্ব এক কিলোমিটার এবং দক্ষিণ বহলার দূরত্ব হতে পারে দেড় কিলোমিটারের মতো। আবার এক বহলা হতে অপর বহলায় আইল পথে যাতায়াত করলে দূরত্ব হয় অর্ধ কিলোমিটারের কিছু বেশি।

রেল সেতু সংলগ্ন বর্তমান গণির মোড় থেকে একটি পাকা রাস্তা দক্ষিণ বহলার মধ্যস্থল দিয়ে বিজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের দিকে গেছে। এই রাস্তার ধারে, বাম দিকে রয়েছে বহলা শহীদ মিনার। শহীদ মিনারটির সামনেই গণহত্যা সংঘটিত হয়।

বহলা একটা গ্রামীণ জনপদ। এখন এই জনপদের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ বহলার দিকে একটি পাকা রাস্তা এবং উত্তর বহলার দিকে আরেকটি অসমাপ্ত পাকা রাস্তা গেলেও মুক্তিযুদ্ধকালে আইলের পথ এবং কাঁচা মেঠো পথ ছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না। বহলার দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বড় বড় জঙ্গল ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এইসব জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলা করার পাশপাশি রাতের বেলা অপারেশন পরিচালনা করত। মুক্তিযোদ্ধারা

অনেক সময় কৃষকের ছদ্মবেশে সেখানে আসা-যাওয়া করত। সুযোগ বুঝে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে পালিয়ে যেত।

পাকিস্তানি বাহিনী ১৪ মার্চ দিনাজপুর শহর পুনর্দখলের পর গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে যায়। বহলাসহ পুরো বিরল, বোচাগঞ্জ, খানসামায় পাকিস্তানি বাহিনীর আধিপত্য চলতে থাকে। বাঙালিদের মধ্যে আতংক সৃষ্টির জন্য তারা বহু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বহলার সাঁতাহার সহ কয়েকটি পাড়ার বিভিন্ন বাড়ি-ঘরেও আগুন ধরিয়ে দেয়। সাঁতাহারের বিভিন্ন পুকুরপাড়ে, ঝোপ-জঙ্গলে ক্যাম্প তৈরি করে। কাঞ্চন রেলস্টেশনের পাশে একটি রাইস মিলে তাদের ক্যাম্প বসিয়ে রেলপথ তদারক ও বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করে। কাঞ্চন রেল জংশনের পাশে তাদের দুইটি বাংকার ছিল।

বহলার দক্ষিণ দিকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে হরগোবিন্দপুর গ্রামে বোচাপুকুর নামে একটি দিঘি আছে। পাকিস্তানি বাহিনী বোচাপুকুরের দিকে আইলের রাস্তায় লাইন ধরে যাতায়াত করত। এরকম লাইন ধরে যাওয়ার সময় একবার মুক্তিযোদ্ধাদের হামলার শিকার হয় পাকিস্তানি বাহিনী। তাদের বেশ ক'জন মারা যায় ঐ হামলায়।

উত্তর বহলার সাতাহারে রয়েছে কাঞ্চন জংশন। এই জংশনের পাশে ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর বাংকার ও ক্যাম্প

যুদ্ধের প্রথম দিকে লোকজন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে পরিস্থিতির উন্নতি হলে অনেকে ফিরে আসে। বহলায় ফিরে আসা লোকজন সবাই ছিলেন মুসলিম। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবাই যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতে যাওয়ার পর ফিরেছেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ফলে এখানে গণহত্যার শিকার হয়েছেন শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে বাঙালিদের জয় হলেও সেটা বেশিদিন ধরে রাখা যায়নি। পাকিস্তানি বাহিনীর পুনঃঅগ্রাভিযানের মুখে একাত্তরের মে মাসের মধ্যে এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। থানা ও গ্রাম পর্যায়ে ঢুকে যায় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। এর ফলে রাজাকাররা উৎসাহিত এবং সংগঠিত হয়ে হামলা চালাতে শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে শান্তি কমিটি গঠন করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানপন্থীরা শক্তি সংহত করতে সমর্থ হয়। জামায়াত নেতা আবুল কাসেমকে চেয়ারম্যান এবং অ্যাডভোকেট এম এ নঈমকে (স্বাধীনতার পর জাতীয় পার্টি নেতা। বর্তমানে মরহুম) সেক্রেটারি করে দিনাজপুর জেলা শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। শহর শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হন অ্যাডভোকেট রহিমউদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে মরহুম)। সদর থানা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হন অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমান খান। শহর শান্তি কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন এ এফ এম রিয়াজুল হক চৌধুরী (এরশাদের শাসনামলে দিনাজপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। বর্তমানে মরহুম)। এছাড়া মরহুম ডাঃ হাফিজ, নূরু চৌধুরী, হাসান আলী, ডাঃ আই এ খান সহ অনেকেই শান্তি কমিটিতে ছিলেন। তবে কমিটির সবাই ক্ষতিকর ছিলেন না। অনেকে বাধ্য হয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে কমিটিতে ছিলেন। আবুল কাসেমসহ দু'একজন ছিলেন ক্ষতিকর। যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহলাসহ বিভিন্ন এলাকায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা, গণহত্যার ঘটনা একের পর এক চালিয়ে যেতে থাকে।

বহলার সাঁতাহারে পাকিস্তানি বাহিনী দুইটি বাংকার খুঁড়েছিল। একটি বাংকার রেললাইনের পাশে, আরেকটি আরেকটি সাঁতাহার জামে মসজিদের পাশে। কাঞ্চন জংশনের নিকটবর্তী মহিউদ্দিনের রাইস মিলে এবং মিলের দক্ষিণ পাশের একটি দিঘির ধারে ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প। মুক্তিযুদ্ধের শেষের এইসব ক্যাম্প বাঙালি নির্যাতনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে বহলাকে যারা নেতৃত্ব দিতেন তাদের অন্যতম ছিলেন মোঃ কলিমউদ্দিন, পিতা বহির মোহাম্মদ, রমজান আলী, পিতা আব্দুল

লতিফ, আফসার আলী, পিতা বুধু পেডা, জবেদ আলী সহ আরো অনেকে। তাদের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে বহলার মানুষ মিছিল, মিটিং ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত থাকতেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ দিনাজপুরে ইপিআরের হেডকোয়ার্টার বাঙালিরা দখল করে নেয়। দখল করতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে বাঙালি ইপিআর বাহিনীর যে যুদ্ধ হয় তাতে বাঙালি ইপিআরদের সহায়তা দিতে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই সময় বহলার লোকজনও বাঙালি ইপিআর বাহিনীকে খাদ্য, পানি ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা করে। এইসব কারণে হয়তো পাকিস্তানি বাহিনী ও আলবদরদের টার্গেটে ছিল বহলাবাসী।

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

বহলা গণহত্যা সংঘটিত হয় একাত্তরের ১৩ ডিসেম্বর সোমবার। উত্তর বহলা সহ অন্য দু-একটি এলাকার লোক তাদের নিজ নিজ বাড়ি-ঘর ছেড়ে দক্ষিণ বহলার বাড়িগুলোতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের প্রায় সকলকে ১৩ ডিসেম্বর বিকালে জড়ো করে সন্ধ্যায় বর্বরোচিতভাবে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী।

বিরলের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় নাস্তানাবুদ হতে হতে ক্রমাগতভাবে পিছিয়ে আসছিল পাকিস্তানি বাহিনী। পরাজয়ের মুখে সম্ভবত ক্ষিপ্ত হয়ে এবং পূর্ববর্তী ঘটনাবলীতে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা এই গণহত্যা চালায়।

ঘটনার দিন দুপুরের পর থেকে পাকিস্তানি বাহিনী রাজাকার, আলবদরদের সহায়তায় দক্ষিণ বহলার সকল বাড়ি থেকে কিশোর, তরুণ ও বয়স্ক পুরুষদের বের করে নিয়ে এসে একটি খোলা প্রান্তরে জড়ো করে রাখে। ধরে আনার সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও আলবদররা অনেককে চড়, থাপ্পর মারে। অনেকের গায়ে লাঠি দিয়েও আঘাত করে। অনেককে গালাগালি করে।

পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার আলবদররা বিভিন্ন বাসা-বাড়ি থেকে যাদেরকেই ধরে নিয়ে আসছিল তাদেরকেই খোলা প্রান্তরে এনে বসিয়ে রাখে। তারপর শেষ বিকেলে তাদেরকে

সেখান থেকে উঠিয়ে এনে কয়েক কদম দূরে বর্তমান বধ্যভূমির স্থানে নিয়ে যায় এবং সেখানে সন্ধ্যায় ব্রাশফায়ারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। গণহত্যার পর তারা অনেক লাশ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখে। গুলি লাগার পর আহতদের অনেকে পানি পানি বলে চিৎকার করছিল। তখন পাকিস্তানি বাহিনী ও আলবদররা আবার গুলি চালায়। এই কারণে প্রথম গুলি বর্ষণের সময় কেউ কেউ গুলিবিদ্ধ না হলেও দ্বিতীয় দফা গুলি বর্ষণে তারা নিহত অথবা আহত হয়।

বহলা গণহত্যা সংঘটিত হয় ১৩ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায়। এর দুইদিন পর ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে এলাকাবাসী লাশের স্তূপের পাশেই একটি বড় গর্ত খুঁড়ে মৃত দেহগুলোকে মাটিচাপা দেয়। মোঃ শফিউদ্দিন, মোঃ আফজাল হোসেন, কালু মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম প্রমুখ লাশ দাফনে অংশ নেন। তখন লাশগুলোয় পচন ধরে এসেছিল এবং গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। তাই লাশগুলো গোসল, জানাজা না করিয়ে যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ঐ অবস্থাতেই মাটিচাপা দেয়া হয়। তবে সকলের লাশ ঐ গণসমাধিতেই আছে এমন নয়। এ প্রসঙ্গে ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী মোঃ মনসুর আলী, পিতা মৃত কলিমউদ্দিন সাং বহলা জানান, গোলাম মইনউদ্দীন মনু ও মহসীন আলীর (চেন্দেরু মোহাম্মদ) লাশ তাদের বাড়ির সামনে এবং তসিরউদ্দিনের লাশ তার বাড়ির পূর্বপাশে দাফন করা হয়েছে।

বহলার যে জায়গাটিতে গণহত্যা সংঘটিত হয় সেই জায়গার মালিক ছিলেন বিজোড়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেনের পিতা মোঃ খলিলউদ্দিন। তিনি সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন। তার বাড়ির সামনেই বর্বরোচিত গণহত্যা সংঘটিত হয়। তার পুত্র মোঃ আকবর আলী ও মোঃ আমিনউদ্দিন গণহত্যায় শহীদ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পর মোঃ খলিলউদ্দিন ঐ জায়গাটি গণসমাধির জায়গা হিসেবে স্থায়ীভাবে ছেড়ে দেন।

এক সাথে বিধবা তিন বোন

আমেনা, কুলসুমা এবং আবেদা। তিন বোন। উত্তর বহলার সাঁতাহার নিবাসী জফের মোহাম্মদ ওরফে জবেদ সাহার মেয়ে। আমেনা বড়, কুলসুমা মেঝ, আবেদা ছোট। তিন বোনের বিয়ে হয়েছিল একই পাড়ায় চাচাত ভাইদের সাথে। বেশ সুখের জীবন ছিল তাদের। তিনজনেই মা

হয়েছিলেন। আমেনা পাঁচ সন্তানের মা ছিলেন। বহলা গণহত্যার সময় তার সন্তানরা একবারেই শিশু ছিল। তাদের বয়স ছিল ১ম সন্তান মোঃ হাসেন ৭ বছর, ২য় সন্তান নেয়ারন বেগম ৬ বছর, ৩য় মফিজুল ইসলাম ৪ বছর, ৪র্থ রফিকুল ইসলাম ২ বছর, ৫ম আফসারুল ইসলাম ৭ দিন। কুলসুমার ছিল তিনপুত্র। মোঃ উসমান, আব্দুল কুদ্দুস ও মোঃ সুবহান। আবেদার ছিল দুই মেয়ে লাইলী বেগম ও রাহেলা বেগম।

আমেনা বেগম বলেন, আমরা তিন বোন এবং আমাদের শ্বশুর, দেবরসহ পরিবারের সবাই পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ে দক্ষিণ বহলার একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে ঐ বাড়িটি ছিল আবুল কাশেমের। বেশ বড় বাড়ি ছিল সেটা। সেখানে আমাদের মতো আরো অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাদের ধারণা ছিল, সাঁতাহারে পাকিস্তানি বাহিনী অত্যাচার নির্যাতন চালালেও বহলায় তা হচ্ছে না। আমরা অন্তত সেখানে নির্যাতন হওয়ার কোনো খবর পাইনি। কিন্তু ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনী, রাজাকার ও আলবদররা দক্ষিণ বহলার সব বাড়ি থেকে পুরুষদের ধরে নিয়ে যায়। তারা আমার স্বামী কালু মোহাম্মদ, কুলসুমার স্বামী মোঃ জাহের, আবেদার স্বামী মোঃ সফিউদ্দিনকেও ধরে নিয়ে যায়। ঐ বাড়ি থেকে ৭-৮ জন পুরুষ মানুষকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। তারা আমাদেরকে বাড়িতেই থেকে যেতে বলে। আমি মনে করেছিলাম, তাদেরকে হয়তো কোনো কাজ করানোর জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ পাকিস্তানি সেনারা বলছিল যে, তারা এই গ্রামে ক্যাম্প করবে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় আমরা বাড়ির ভিতর থেকে ব্রাশফায়ারের শব্দ শুনতে পাই। তারপর শুনতে পাই যে, সব পুরুষ মানুষদেরকে নিষ্ঠুরভাবে এক সাথে হত্যা করা হয়েছে। আমরা সেদিনের মর্মান্তিক গণহত্যায় আপন তিন বোন বিধবা হয়েছি। আমার স্বামীসহ আমার বোনের স্বামীরা এক সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্রাশফায়ারে শহীদ হয়েছে। আমি এবং আমার বোন কুলসুমা স্বামীর পাশাপাশি আমাদের শ্বশুরকেও সেদিন হারিয়েছি আমার শ্বশুরের নাম ছিল আছিরউদ্দিন। আবার কুলসুমার শ্বশুরেরও নাম ছিল মোঃ আছিরউদ্দীন। দুই বোনের দুই শ্বশুর। দুজনেই আলাদা ব্যক্তি হলেও তাদের নামের মিল ছিল। আমার আরেক বোন আবেদা বেগমের ভাশুর আব্দুর রহমানকেও এদিন একই ঘটনায় গণহত্যা করে পাক সেনারা।

তিন সহোদরকে হত্যা

মোঃ শাহাবুদ্দিন, মোঃ খমিরউদ্দিন, আব্দুল ওয়াহাব। মৃত খৈতু মোহাম্মদের তিনপুত্র। তিন ভাই। প্রত্যেকের বিয়ে হয়েছিল এবং সন্তানের জনক ছিলেন। কৃষি কাজ করে সংসার চালাতেন তিনজনে।

পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ে উত্তর বহলা ছেড়ে তারা সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন দক্ষিণ বহলায় আবুল কাসেমের বাড়িতে। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী, রাজাকার, আলবদররা এই তিন ভাইকে ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এক সাথে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

মৃত্যুকালে শাহাবুদ্দিন ৬ সন্তানের জনক ছিলেন। সন্তানদের নাম আনারুল ইসলাম (বর্তমানে মৃত), সাজেদা খাতুন (বর্তমানে মৃত), আমিনুল ইসলাম (বর্তমান বয়স ৫০), আনসারুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম ও পারভীন বেগম (বিয়ে হয়েছে মঙ্গলপুরে। স্বামী তফাজ্জল হোসেন)।

শাহাবুদ্দিনের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম বলেন, আমার স্বামী যখন গণহত্যার শিকার হয় তার তখন আমি সন্তানসম্ভবা ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের পর জন্ম নিয়েছিল আমার সবচেয়ে ছোট সন্তান শহীদুল। সে এখন পেশাগতভাবে একজন রং মিস্ত্রি। তার ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে রয়েছে। আমি রাইস মিলে চাতাল শ্রমিকের কাজ করে সন্তানদের অনেক কষ্টে বড় করে তুলেছি।

গণহত্যার সময় ৩২ বছর বয়সী খমিরউদ্দিন দুই সন্তানের জনক ছিলেন। তাদের নাম আখতারুল ইসলাম ও মোখতারুল ইসলাম। খমিরের স্ত্রীর নাম জবেদা খাতুন। জবেদা খাতুন বলেন, যেদিন গণহত্যার ঘটনা ঘটে সেদিন আমরা দক্ষিণ বহলায় জনৈক আবুল কাশেমের বাড়িতে ছিলাম। সেখানে সেদিন কী কারণে যেন খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। একটা উৎসব উৎসব ভাব ছিল। গরুও জবাই করা হয়েছিল। কিন্তু কী যে হলো, সব শেষ হয়ে গেল। বিকালের দিকে হঠাৎ করে পাকিস্তানি বাহিনী ঐ বাড়িতে ঢুকে আমাদের সব পুরুষ মানুষদেরকে ধরে নিয়ে। তারপর সন্ধ্যায় তাদেরকে এক সাথে ব্রাশফায়ার দিয়ে মেরে ফেলল। প্রথম গুলির পর আহতরা যখন পানি পানি বলে চিৎকার করছিল, তখন পাকিস্তানি বাহিনী আবার গুলি মারে।

ইসাহাক আলী ও জয়নাল আবেদীন ছিলেন আপন দুই সহদোর। তাদের পিতার নাম মোঃ আজিজ মোল্লা। ১৩ ডিম্বের সন্ধায় তাদেরকেও হত্যা করা হয় এক সাথে।

বিজোড়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান বহলা নিবাসী আমজাদ হোসেনের আপন দুই ভাই আকবর আলী ও আমিন আলীকে একসাথে হত্যা করা হয় এই দিনে। ২০ বছর বয়সী আমিন তখন দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়তেন। আমিন ছিলেন এসএসসি পরীক্ষার্থী।

পিতা-পুত্র হত্যা

বহলা গণহত্যায় এক সাথে পিতা-পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আঁখি মোহাম্মদ ও বাবুল মোহাম্মদ ওরফে মোঃ টাচরু ছিলেন পিতা-পুত্র। পাকিস্তানি বাহিনী ও আলবদররা তাদেরকে এক সাথে গুলি করে। ঐ গুলি বর্ষণে মারা যান তসির মোহাম্মদ ও তার পুত্র নূর মোহাম্মদ এবং বারেক মোহাম্মদ ও তার পুত্র রহিমউদ্দিন।

শহীদ আঁখি মোহাম্মদের স্ত্রী তমিজান বেওয়ার বয়স এখন ৮৫ ছাড়িয়েছে। তবে এখনো সব কাজ করতে পারেন। একাত্তরের সেই দিনের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, তখন উত্তর বহলার দিঘীর পাড়ে পাকিস্তানি সেনারা থাকত। তারা মাঝে মাঝে আমার স্বামীকে কালো পোশাক পরিয়ে নিয়ে যেত। রাতের বেলা তাকে কখনো রাস্তার ধারে, কখনো রেললাইনের ধারে পাহারায় বসাত। গণহত্যার দিনেও তারা আমার স্বামীকে এবং আমার ছেলে বাবুল মোহাম্মদকে ধরে নিয়ে যায়। সেইদিন তারা কোনো পোশাক পরায় নাই। তারপর সন্ধ্যাবেলা শুনি আমার স্বামী ও ছেলে সহ পুরুষ মানুষদেরকে সাইর সাইর করে দাঁড় করিয়ে এক সাথে মেরে ফেলেছে। পাকিস্তানি সেনারা তাদেরকে প্রথমে ব্রাশফায়ার করেছে। পরে আবার গুলি করেছে। গুলি করার পর লাশগুলোকে রাইফেলের আগায় থাকা চাকু দিয়ে খোঁচাইছে। এইভাবে মানুষগেলাকে খুব কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলেছে।

পিতাসহ দুই পুত্র হত্যা

মুক্তিযুদ্ধকালে সাঁতাহারের মোঃ আছিরউদ্দিনের বয়স ছিল প্রায় ৭৫। একজন কৃষক ছিলেন তিনি। তার দুই পুত্র আব্দুল রহমান ও সফি মোহাম্মদের বয়স তখন ৫০ ও ৫২। আরেক ছেলে মহিরউদ্দিনের বয়স তখন ২৭-২৮। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের সবাইকে একসাথে ধরে নিয়ে যায় এবং গণহত্যা করে। সৌভাগ্যবশত মহিরউদ্দিন গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরেও বেঁচে যান। কিন্তু কৃষক আছির ও তার অন্য দুই পুত্র এক সাথে শহীদ হন। আব্দুল রহমান শহীদ হওয়ার সপ্তাহখানেক

আগে পুত্র সন্তানের জনক হয়েছিলেন। তার নাম রাখা হয় রহিদুল ইসলাম। পিতৃস্নেহ ছাড়াই তিনি বড় হয়েছেন এবং ৪৩ বছর ধরে কল্পনায় পিতার মুখ খুঁজেছেন।

গণহত্যায় আহত মোঃ মহিরউদ্দিন বলেন, পাকিস্তানি বাহিনী আমাকে, আমার বাবাকেসহ গ্রামের প্রায় সব পুরুষ মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাখে। আমরা যেন পালিয়ে যেতে না পারি সে জন্য আমাদেরকে একটি খোলা জায়গায় রেখে চতুর্দিক থেকে অস্ত্র উঁচিয়ে ঘিরে রাখে। এর এক-দেড় ঘন্টা পর আমাদেরকে উঠিয়ে কয়েক কদম দূরে বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেনের বাড়ির সামনে নিয়ে যায়। তারপর সেখানেই ধের ধের- ধের ধের করে গুলি চালায় এবং আমরা সবাই পড়ে যাই। আমার ভাগ্য ভালো যে, আমি এখনো বেঁচে আছি। কিন্তু আমার বাবাসহ অসংখ্য মানুষ সেই ঘটনায় শহীদ হয়েছেন।

দেবদাস চক্রবর্তী
১৯৯১
ড্রইং

আমেনা বেওয়া
(শহীদ কালুর স্ত্রী

জবেদা বেওয়া
(শহীদ খমিরউদ্দিনের স্ত্রী)

গণহত্যা-নির্যাতনকারীর পরিচয়

বহলা গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আলবদর বাহিনীও সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। শরিফ খান নামে একজন পাকিস্তানি সৈন্যের কথা ভুক্তভোগীদের কেউ কেউ বলেছেন। ভুক্তভোগী হাফিজউদ্দীন, পিতা আব্দুল আজিজের মতে এই শরীফ খানের নির্দেশে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। অনেকে বাচ্চা খান নামে একজন বিহারির কথা বলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাহাদুর বাজার নিবাসী বাচ্চা খান বাঙালিদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিল। তার নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট চালায় এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটায়। সম্ভবত বহলার ঘটনায় আলবদর বাহিনীর নেতৃত্ব তার হাতেই ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর বাচ্চা খান দিনাজপুর শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নীলফামারীর সৈয়দপুরে যান। পরবর্তীতে পাকিস্তান চলে যান। অপরদিকে বহলার হোসেন আলী নামে একজন ছিলেন শান্তি কমিটির সদস্য। পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যরা প্রায়ই তার সাথে কথা বলত বলে কেউ কেউ জানিয়েছেন। গণহত্যার সময় তার নিজের ভাইও শহীদ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পর কিছুদিন পালিয়ে থাকলেও পরে এলাকাবাসী তাকে ক্ষমা করে দেয়ায় গ্রামে ফিরে আসেন। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের শিকার আব্দুল গণি জানান, হোসেন আলী আমাদেরই আত্মীয় ও প্রতিবেশি। বঙ্গবন্ধু যখন রাজাকার, আলবদর সহ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন, তখন আমরাও তাকে ক্ষমা করে দেই। তাছাড়া তিনি হয়তো বুঝে উঠতে পারেননি যে, এ ধরনের একটা গণহত্যা হবে। হোসেন আলী ৪ বছর আগে মারা গেছেন।

মোস্তফা মনোয়ার, শহীদ সন্তান, তেল রং, ১৯৭২

শহীদ শনাক্তকরণ ও পরিচয়

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১	মোঃ শাহাবুদ্দিন	মৃত খৈতু মোহাম্মদ	সাঁতাহার, উত্তর বহলা	বিজোড়া
২	মোঃ খমিরউদ্দিন	মৃত খৈতু মোহাম্মদ	সাঁতাহার, উত্তর বহলা	বিজোড়া
৩	আব্দুল ওয়াহাব	মৃত খৈতু মোহাম্মদ	সাঁতাহার, উত্তর বহলা	বিজোড়া
৪	মোসলেমউদ্দিন	তারি মোহাম্মদ	সাঁতাহার, উত্তর বহলা	বিজোড়া
৫	মোঃ সফিউদ্দিন	মৃত আছিরউদ্দিন	সাঁতাহার, উত্তর বহলা	বিজোড়া
৬	আব্দুর রহমান	মৃত আছিরউদ্দিন	সাঁতাহার, উত্তর বহলা	বিজোড়া
৭	কালু মোহাম্মদ	মৃত আছির মোহাম্মদ	সাঁতাহার, উত্তর বহলা	বিজোড়া
৮	মোঃ জাহের	ভদো মোহাম্মদ	সাঁতাহার, উত্তর বহলা	বিজোড়া
৯	বাবুল মোহাম্মদ টাচরু	আঁখি মোহাম্মদ	সাঁতাহার, উত্তর বহলা	বিজোড়া
১০	মোঃ মজিতুল্লাহ	মুনির মোহাম্মদ	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
১১	তসির মোহাম্মদ	মিয়া বকস মোল্লা	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
১২	নুর মোহাম্মদ	তসির মোহাম্মদ	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
১৩	ছপি মোহাম্মদ	চেনা মোহাম্মদ	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
১৪	রবিতুল্লাহ	জামাল মোহাম্মদ	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
১৫	আকবর আলী	মোঃ খলিলউদ্দিন	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
১৬	আমিন আলী	মোঃ খলিলউদ্দিন	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়ার ইউপি চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেনের ভাই
১৭	মোঃ ইছাহাক আলী	আব্দুল আজিজ	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
১৮	মোঃ জয়নাল আবেদীন	আব্দুল আজিজ	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
১৯	রহিমউদ্দিন	বারেক মোহাম্মদ	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
২০	গোলাম মোস্তফা	রহিমউদ্দিন	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
২১	আব্দুল করিম	আজির মোহাম্মদ	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
২২	মহসীন আলী	খাজিরউদ্দিন মোল্লা	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
২৩	গোলাম মইনউদ্দিন মনু	মফিজউদ্দীন পণ্ডিত	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
২৪	উমর আলী	মছো মোহাম্মদ	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
২৫	ভুতা মোহাম্মদ	মোঃ ছলিমউদ্দীন	উত্তর বহলা	বিজোড়া
২৬	মুন্সী আব্দুল জব্বার		সাঁতাহার উত্তর বহলা	বিজোড়া
২৭	বারেক মোহাম্মদ		দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
২৮	সোহরাব আলী	বহলার হবিবর রহমানের বাড়িতে কামলা ছিলেন	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
২৯	আব্দুস সাত্তার	মৃত আব্দুস সোবহান	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
৩০	মোঃ ইব্রাহীম		দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
৩১	আব্দুল মজিদ		দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
৩২	মহসীন আলী (চেন্দেরু মোহাম্মদ)	খাজোউদ্দিন	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
৩৩	আবুল হোসেন		দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
৩৪	আঁখি মোহাম্মদ	নজিমউদ্দিন	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
৩৫	আব্দুল লতিফ (লতি)	কেতাব মোহাম্মদ	উত্তর বহলা	বিজোড়া
৩৬	আজিলউদ্দীন মুন্সী (ফকিরবুড়া)	ইমাম, বহলা মসজিদ	দক্ষিণ বহলা	গাইবান্ধা
৩৭	ছামির মোহাম্মদ	আছির মোহাম্মদ	দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া
৩৮	নতি মোহম্মদ		দক্ষিণ বহলা	বিজোড়া

ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা

বহলা গণহত্যায় নির্যাতিত অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন। নিহত এবং নির্যাতিতদের বেশির ভাগ ছিলেন এই গ্রামের। ফলে এই গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী এবং নির্যাতিত অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রম	নাম	পিতা/স্বামী	গ্রাম	বিবরণ
১	মোঃ হাফিজউদ্দিন	মোঃ আজিজ মোল্লা	দক্ষিণ বহলা	দুই ভাইকে হত্যা
২	রাশিদা খাতুন	শহীদ ইছাহাক	দক্ষিণ বহলা	পিতাকে হত্যা
৩	আমজাদ হোসেন	মোঃ খলিলউদ্দিন	দক্ষিণ বহলা	দুই ভাইকে হত্যা
৪	গণি মোহাম্মদ	শহীদ তসিরউদ্দিন	দক্ষিণ বহলা	পিতাকে হত্যা
৫	হামিদা খাতুন	শহীদ আঃ সাত্তার	দক্ষিণ বহলা	স্বামীকে হত্যা
৬	মোঃ সৈয়দুর রহমান তুষার	শহীদ আঃ সাত্তার	দক্ষিণ বহলা	পিতাকে হত্যা
৭	মোঃ সফিউদ্দিন	মৃত ততি মোহাম্মদ	দক্ষিণ বহলা	গণহত্যা দর্শন
৮	আয়েশা খাতুন	শহীদ জয়নাল আবেদীন	দক্ষিণ বহলা	স্বামীকে হত্যা
৯	আজাহার আলী	শহীদ জয়নাল আবেদীন	দক্ষিণ বহলা	পিতাকে হত্যা
১০	মোতাহার আলী	শহীদ জয়নাল আবেদীন	দক্ষিণ বহলা	পিতাকে হত্যা
১১	রেয়াজুল ইসলাম		বাসিয়াপাড়া	ধরা পড়েছিলেন
১২	মজিবর রহমান	শহীদ মোসলেমউদ্দিন	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
১৩	জবেদা বেওয়া	শহীদ খমিরউদ্দিন	সাঁতাহার	স্বামীকে হত্যা
১৪	আখতারুল ইসলাম	শহীদ খমিরউদ্দিন	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
১৫	মোখতারুল ইসলাম	শহীদ খমিরউদ্দিন	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
১৬	আমিনুল ইসলাম	শহীদ মোঃ শাহাবুদ্দিন	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
১৭	শহীদুল ইসলাম	শহীদ মোঃ শাহাবুদ্দিন	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
১৮	হালিমা বেগম	শহীদ ভুতা মোহাম্মদ	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
১৯	আমেনা বেওয়া	শহীদ মোঃ কালু	সাঁতাহার	স্বামীকে হত্যা

ক্রম	নাম	পিতা/স্বামী	গ্রাম	বিবরণ
২০	কুলসুমা বেগম	শহীদ জাহের	সাঁতাহার	স্বামীকে হত্যা
২১	আবেদা বেওয়া	শহীদ সফিউদ্দিন	সাঁতাহার	স্বামীকে হত্যা
২২	নেয়ারন	শহীদ কালু মোহাম্মদ	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
২৩	মফিজুল ইসলাম	পিতাকে হত্যা	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
২৪	রফিকুল ইসলাম	পিতাকে হত্যা	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
২৫	আফসারুল ইসলাম	পিতাকে হত্যা	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
২৬	ওলেসা বেগম	স্বামী- তমিজউদ্দিন	সাঁতাহার	শ্বশুর ও দেবরকে হত্যা
২৭	মোঃ উসমান	শহীদ জাহের	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
২৮	আব্দুল কুদ্দুস	শহীদ জাহের	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
২৯	মোঃ সুবহান	শহীদ জাহের	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
৩০	মোঃ তমিজউদ্দিন	শহীদ আঁখি মোহাম্মদ	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
৩১	মোঃ বাবুল	শহীদ আঁখি মোহাম্মদ	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
৩২	মোকসেদ আলী	শহীদ আঁখি মোহাম্মদ	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
৩৩	আশেদা বেগম	শহীদ আঁখি মোহাম্মদ	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
৩৪	লাইলী বেগম	শহীদ আঁখি মোহাম্মদ	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা
৩৫	তমিজান বেওয়া	শহীদ আঁখি মোহাম্মদ	সাঁতাহার	স্বামীকে হত্যা
৩৬	মোঃ রহিদুল ইসলাম	শহীদ আব্দুল রহমান	সাঁতাহার	পিতাকে হত্যা

বহলা গণহত্যায় আহতদের তালিকা

ক্রম	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	ঠিকানা	বর্তমান অবস্থা
১	আনিসুর রহমান	মৃত হবিবর রহমান		দক্ষিণ বহলা	কৃষক
২	মোঃ মতিয়ার রহমান	শহীদ ইছাহাক আলী		”	দিমেকের গাড়ির ড্রাইভার
৩	মহিরউদ্দিন	মৃত ইমান আলী		সাঁতাহার	তহশিল অফিসের পিয়ন
৪	নজরুল ইসলাম কড়ি	মৃত কাঞ্চিয়া মোহাম্মদ	৭১	সাঁতাহার	বেকার
৫	তফিল মাহমুদ	খেতু মোহাম্মদ		সাঁতাহার	মারা গেছেন
৬	খতিবুদ্দিন (নেন্দেরা)			সাঁতাহার	মারা গেছেন
৭	মোঃ মহিরউদ্দিন	মৃত আছিরউদ্দিন	”	সাঁতাহার	কৃষক

নির্যাতিতদের মৌখিকভাষ্য

বহলা গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ও নির্যাতিতরা এখনও অনেকে জীবিত আছেন। স্বাধীনতার এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সরকারিভাবে কোনো সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার কারণে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে। যারা শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারকেও শহীদ পরিবার হিসেবে তেমন কোনো মর্যাদা দেয়া হয়নি। বরং সুযোগ-সুবিধা দেয়ার নামে তাদের কাছ থেকে অনেকেই টাকা হাতিয়ে নিয়ে প্রতারিত করেছে। এই কারণে শহীদ পরিবারের লোকজন এবং ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতরা সহজে গণহত্যা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। তবে শহীদ আব্দুস সাত্তারের পুত্র সৈয়দুর রহমান তুষার এ বিষয়ে বর্তমান লেখককে সহায়তা করেন। তাঁর সহযোগিতায় বহলার শহীদ পরিবার এবং ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের সাথে আলাপ করে সার্বিক চিত্র তুলে আনার চেষ্টা করেছি। এখানে কয়েকজনের মৌখিক ভাষ্য সংকলিত হল–

মুর্তজা বশীর
শহীদ শিরোনাম
তেল রং, ১৯৭৬

মোঃ হাফিজউদ্দিন (৮৫)

পিতা- মৃত মোঃ আজিজ মোল্লা, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : বিরল, দিনাজপুর, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : দক্ষিণ বহলার নিজ বাড়ি, ৬ জানুয়ারি ২০১৫

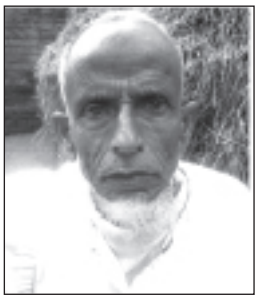

মোঃ হাফিজউদ্দিন

মুক্তিযুদ্ধকালে আমরা তিন ভাই, তিন বোন ছিলাম। আমার ভাই-বোনদের নাম ছিল লতিফা বেগম, খতেজা খাতুন, মোঃ ইসাহাক, জয়নাল আবেদীন, এরপর আমি ও আতেকা খাতুন। আমরা তিন ভাই বিবাহিত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে যখন খুব পিটাপিটি হচ্ছিল তখন আমরা সবাই ইন্ডিয়া চলে গিয়েছিলাম।

ইন্ডিয়ায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি করে প্রায় তিন মাস ছিলাম। আমরা আষাঢ় মাসে গিয়ে আবার শাওন মাসে ফিরে আসি দেশের অবস্থা ভালো হয়েছে এমন কথা শুনে। এখানে এসে আমরা আমন ধান লাগাই। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কেটে ধানের পুঁজ করে রেখে অনেকে কলম চারাও লাগায়। সেই সময় এই গণহত্যা চালানো হয়। যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তাদের অনেকেই বাড়িতে ধানের পুঁজ করে রেখেছিল। পাকিস্তানি বাহিনী সেই পুঁজ পুড়াপুড়ি করেছে। মেয়েদেরেকেও লাইন ধরে তারা খাড়া করেছিল। পরে মেয়েদেরকে ছেড়ে দেয় কিন্তু ছেলেদেরকে ব্রাশফায়ার করে।

যেদিন আমাদের এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী ও আলবদররা গণহত্যা চালায় সেইদিন আমরা বাড়িতেই ছিলাম। এমন একটা ঘটনা ঘটবে এটা কল্পনার বাইরে ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী বিহারী আলবদরদের সঙ্গে নিয়ে দুপুরের পর চতুর্দিক থেকে আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলে। তারা কাঞ্চন জংশন হয়ে এইদিকে এসেছিল। এখানে এসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলে মানুষদের ধরে এনে একটি খোলা জায়গায় বসিয়ে রাখে। একশ' জনেরও বেশি লোককে তারা ধরে আনে। তারপর সন্ধ্যার দিকে বহলার বর্তমান শহীদ মিনারের জায়গাটার কাছে নিয়ে গিয়ে মাগরিবের নামাজ শেষ হতে না হতেই বলে দাঁড়াও। তারপরে সাথে সাথেই ব্রাশফায়ার শুরু করে। তখন বাঙালিদের অনেকে ছুটাছুটি শুরু করে দেয়। ছুটাছুটি করে অনেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। আমিও পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাই। ব্রাশফায়ারে আমার দুই ভাই মোঃ ইসাহাক এবং জয়নাল আবেদীন, আমার বড় আব্বা বারেক মোহাম্মদ এবং চাচাত ভাই রহিমউদ্দীন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। আমার জানামতে শরিফ খান নামের একজন পাকিস্তানি বাহিনীর কমান্ডার গুলির নির্দেশ দিয়েছিল। গুলিবর্ষণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ছুটাছুটি করে পালাতে গিয়ে আইলের উপর পড়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার উপর দিয়ে অনেক গুলি চলে যায়। একজন বয়স্ক লোক আমাকে টেনে তুলে বলে, 'বাঁচিবুতে পালা।' তারপর তিনিও দৌড় দেন, আমিও দৌড় দেই। ঐ ঘটনায় আমার এক ভাতিজা শহীদ ইসাহাকের ছেলে মতিয়ার গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তবে আল্লাহর রহমতে সে এখনো বেঁচে আছে।

এতবড় গণহত্যার পর আমি কালিয়াগঞ্জ শালবাড়ির দিকে পালিয়ে যাই। যখন ফিরে আসি তখন দেখি সব লাশ খর দিয়ে ঢেকে রাখা। লাশ গন্ধ ধরে গিয়েছিল। গন্ধে কাছে যাওয়া যাচ্ছিল না। এই ঘটনায় কতজন মারা গিয়েছিল বলা যাবে না। আমার ধারণা ৬০-৬৫ জন

মারা গিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরদিন আমরা কয়েকজন মিলে লাশগুলোর পাশে একটা খাল করে সব লাশ এক সাথে মাটি চাপা দেই। আমি নিজেই ৭টি লাশ তুলেছিলাম। এরপর ১৫ দিনেও ভাত খেতে পারি নাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম না। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছি। এখন দেখি যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তারাই বড় মুক্তিযোদ্ধা সেজে বসে আছে। আর যারা বাংলাদেশের জন্য কাজ করেছে, জীবন দিয়েছে, গণহত্যার শিকার হয়েছে তাদের কিংবা তাদের পরিবারের কোনো খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে না।

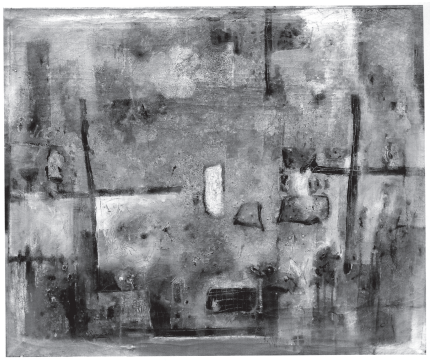

রেজাউল করিম
গণহত্যা-২
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
২০১১

হামিদা খাতুন (৬২)

স্বামী : শহীদ আব্দুস সাত্তার, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আমার বাবার বাড়ি বহলায়, শ্বশুর বাড়ি বালুয়াডাঙ্গায়। একাত্তরে দেশের অবস্থা ভালো ছিল না। আমাদের মনেও শান্তি ছিল না। কখন কী হয় সেই ভয়ে সব সময় ভীত ছিলাম। একেক সময় একেক কথা শুনছিলাম। চরম অস্থিরতার মুখে যুদ্ধের আগে আমরা সপরিবারে বহলায় বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলাম। সেই যে এসেছি তখন থেকে এখনো পর্যন্ত এখানেই আছি।

হামিদা খাতুন

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন বেড়ে গিয়েছিল। তারা বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে লুটতরাজ ও ভাঙ্গচুর করত। পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের বাড়িতে, রহিমুদ্দিন, মহসীন, বারেক মোহাম্মদ সহ আরো অনেকের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট চালায়। তারা এইসব বাড়ি থেকে মুরগী-ছাগল

ধরে নিয়ে যায়। ডিম পেলে সেটাও নিয়ে গেছে। তাই ভয় পেয়ে আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। পালিয়ে প্রায় ৪ মাইল দুরের আরো ভিতরে সারাঙ্গাই দত্তপাড়ায় গিয়ে উঠি। পলাশবাড়ি ইউনিয়নের (বিরল) এই গ্রামে আমার বোন হাবিবা খাতুনের বাড়ি। তার স্বামীর নাম মোঃ ইসমাইল মিয়া। আমাদের মতো গ্রামের আরো অনেকেই চলে গিয়েছিল। কেউ কেউ বাংলাদেশের ভিতরে ছিল, কেউ কেউ ভারতে গিয়েছিল। আমার বাবার চাচাত ভাই বরকতুল্লাহ ও শরিয়তুল্লাহ সপরিবারে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। তারা ফিরেছেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর।

সারাঙ্গাই দত্তপাড়ায় আমরা প্রায় আড়াই-তিন দিন ছিলাম। এরপর পরিস্থিতি ভালো হলে আমরা আবার বহলায় বাবার বাড়িতে ফিরে আসি। আমি ফিরে আসার এক মাসের মধ্যে আমার বাবা মফিজউদ্দিন আহমেদ মারা যান। আমাদের মতো আরো অনেকে এখানে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। স্বাধীন হওয়ার দুই দিন আগে সোমবার আছর নামাজের পরে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রাম ঘেরাও করে। পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামের সবকয়টি বাড়িতে ঢুকে আর বলে, তোমরা বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যাও, আমরা এখানে ক্যাম্প করব। তাদের কথায় বিশ্বাস করে গ্রামের সবাই বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তারা কাউকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যেতে দিচ্ছিল না। তারা বাইরে বের হয়ে আসা মেয়েদেরকে আবুল কাসেমের বাড়িতে জোর করে ঢুকিয়ে দেয় আর পুরুষ মানুষদেরকে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বর্তমান শহীদ মিনারের স্থানে নিয়ে আসে। পাকিস্তানি বাহিনী প্রায় ৬০-৭০ জনকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। তারপর মাগরিবের নামাজের আগে আগে ব্রাশফায়ার করে। তখন গুলির আওয়াজ এমন জোরে হচ্ছিল যে কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছিল। গুলি যখন শেষ হলো দেড় বছরের তুষার তখন আমার কোলে। আমি বুঝে ফেলি যে, আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। তারা আমার স্বামী, আমার ছোট ভাই মনুকে মেরে ফেলেছে। আমার আর মন মানছিল না। তুষার আর ৮ বছরের মেয়ে হাসানে বানুকে নিয়ে তখুনি বাড়ি থেকে বের হয়ে মানপুরে চলে যাই। সেখান থেকে যাই বিজোড়া হাই স্কুলে। এরপর যাই সারেঙ্গা দত্তপাড়ায় বড় বোন হাবিবার বাড়িতে। তারপর সেখান থেকে আরো প্রায় ৩ মাইল দূর বৈদ্যনাথপুরে যাই। বৈদ্যনাথপুরে থাকার সময় বৃহস্পতিবার হৈ চৈ পড়ে যায় যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার কথায় মন আরো অস্থির হয়ে পড়ে। আমরা শুক্রবার আবার বহলায় ফিরে আসি। আমি স্বামী, ছোট ভাইয়ের লাশ সহ কারো লাশ দেখতে পারিনি। এটা আমার মনে অনেক কষ্ট দেয়। তাদের লাশ বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার দিনে আমাদের গ্রামের লোকেরা এক কবরে দাফন করেছিল। স্বামীর লাশ এখানে আছে। তাই শ্বশুরবাড়ি না গিয়ে আজও স্বামীর লাশের পাশেই থেকে গেছি।

আয়েশা খাতুন (৭৫)

স্বামী : শহীদ জয়নাল আবেদীন , গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৬ জানুয়ারি ২০১৫

আয়েশা খাতুন

যুদ্ধকালে আমার সবচেয়ে বড় ছেলে আজাহার আলীর বয়স ৫ বছরের মতো ছিল। ছোট ছেলে মোতাহার আলীর বয়স ছিল ৩ বছর। মেয়ে জিন্নাত আরা বেগম ছিল কোলের বাচ্চা। আমার স্বামীর বয়স ছিল ৩৪-৩৫। তিনি কৃষি কাজ, গাড়ি বাওয়া ও ব্যবসা করতেন। ঘটনাটা ছিল অগ্রহায়ণ মাসের সোমবার। সেদিন তিনি বাড়িতে ৫ কেজি মাংস নিয়ে এসেছিলেন। বাচ্চারা খালি গোস্ত খাম গোস্ত খাম করছিল। কিন্তু এতগুলো মাংস কি হবে? তাই মাংসটা দুইভাগ করে অর্ধেক রান্না করি, অর্ধেক রেখে দিই। তিনি মাংস দিয়ে বহলার হিন্দুপাড়ায় যান। সেখানে সরিষা ফেলেন। সরিষা লাগানোর পর বিকালে বাড়িতে আসেন। বাচ্চারা গোস্ত খায়। কিন্তু আমার স্বামী খায়নি। তিনি দৌড় দিয়ে বাইরে গরু আনতে গেলে হুজ্জত খেয়ে পড়ে যান। তখন মস্করা করে বলেন, আইজকা বোধহয় মোর শ্বশুর মোর নাম করেছে, এইতনে পড়ি গেইনু। আমি স্বামীর কাছে আগাই গিয়ে দেখতে পাই পোশাক পরা খান সেনারা আইসেছে। আমরা পালাবার চেষ্টা করি। কিন্তু খানেরা তরতর করি আমাদের বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকি পড়ে। কয়েকজনকে ধরে। হাফি, আমার বুড়ি, আলমের মা পালাবার চেষ্টা করলে খানেরা তাদেরকে ভাড়াম ভাড়াম করি মারে। আমার স্বামীকেও ভাড়াম করি মারে। যেই মানুষগেলা টোপলা-টুপলি নিছিল তাদেরকে ভাড়াম ভাড়াম করি মারে। খানেরা বলে, পালাবার যদি চাও বেটারা তোমাদের বউ-বেটিকে পাতাল সিদ্ধ করব। এরপর আমার স্বামীসহ পুরুষ মানুষগেলাক ধরি নি গেল। সন্ধ্যা বেলা ব্রাশফায়ারের শব্দ শুনা গেল। মতিয়ারের মা বাইরে থাকি দৌড়াই আসি চিৎকার করিবা লাগিল

মুর্তজা বশীর
শহীদ শিরোনাম
তেল রং, ১৯৭৬

বাপরে বাপ মানুষলাক মারি ফেলাইল। হামরা তখন বুঝিনো সব শেষ। হামরা রাইতটা বাড়িতে থাকিনো। কিন্তু মঙ্গলবার ভোর বেলা আবার খানেরা হামার বাড়িত আসে। দরজা ভাঙ্গি বাড়ির ভিতর ঢুকি পড়ে। জিজ্ঞাসা করে, বিড়ি কে বেচে? তারা বিড়ি নেবার নাম করি আমার বড় ছেলে আজাহারক নিয়া যায়। তারপর যখন অক ছাড়িল, তখন দেখিনো অঁয় বিন বিন করি ঘুরেছে। এরপর আর থাকি নাই। ঘরবাড়ি ছাড়ি হামরা পালাই যাই। পলাশবাড়ি যাইয়া মুই অজ্ঞান হই যাও।

আব্দুল গণি

পিতা- শহীদ তসিরউদ্দিন, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মুক্তিযুদ্ধকালে আমার বাবা শহীদ তসিরউদ্দিন একজন কৃষক ছিলেন। আমার বড় ভাই শহীদ নূর মোহাম্মদ ছিলেন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। ১৩ ডিসেম্বর সোমবার পাকিস্তানি বাহিনী আমার বাবা, ভাইসহ আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আমাদেরকে একখানে জড়ো করে। কিন্তু আমার ভাই আমাকে বলে, তুই ছোট আছিস, চলে যা। আমি কথা বলছি দেখে পাক সেনারা আমাকে রাইফেলের গোড়া দিয়ে পাড়াম করে বাড়ি মারে। আর ওরে বাপরে বলে লুঙ্গি উপরে উঠায়ে আমি ঝাড়ে কষে দৌড় দিই। আমি পালিয়ে যেতে সমর্থ হই। পালিয়ে তেঘড়া চলে যাই। কিন্তু আমার বাবা ও ভাই মারা যায়।

তমিজান বেওয়া (৮৫)

স্বামী : শহীদ আঁখি মোহাম্মদ , গ্রাম : সাঁতাহার বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৬ জানুয়ারি ২০১৫

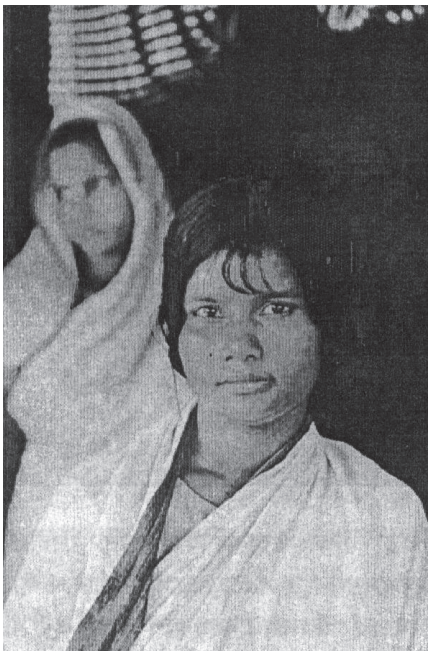

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা

আব্দুল গণি

যুদ্ধের প্রথম দিকে সাঁতাহারের সব বাড়ি পাকিস্তানি বাহিনী জ্বালাই দিছিল। হামার বাড়িটাও পুড়ি গেইছিল সেই সময়। তখন হামরা সবাই ভারত চলি যাই। কিন্তু দেশে শান্তি ফিরি আসিছে এমন কাথা শুনিয়া ৩-৪ মাস পর ফিরি আসি।

তমিজান বেওয়া

সাঁতাহারের জঙ্গলে, পুকুরপাড়ে, ডাঙ্গায় পাক সেনাদের ক্যাম্প ছিল। তারা প্রায় প্রায়ই আমার স্বামীকে পোশাক পিন্ধাইয়া এইথে সেইথে নিয়া যাইত। তিনি কৃষক মানুষ ছিলেন। কাজ কাম নিয়া ব্যস্ত থাইকতেন। তাও তাক নিয়া গিয়া রাস্তা পাহাড়া দেওয়াইত। হোসেন বুড়া নামে একজনের সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর খুব খাতির ছিল। তাকে নাকি একজন পাকিস্তানি সেনা বলি দিছিল যে, তিনি যেন গ্রামের সব পুরুষ মানুষক সরি যাবার কন। কিন্তু কাউকে কহেন নাই। ফলে হামার স্বামী গেল, হামার বেটা গেল, গ্রামের মানুষলাও গেল।

যুদ্ধের সময় হামার বেটাবেটি ছিল ৬ জন। এর মধ্যে বড় বেটা তমিজের বিয়া হইছিল। এর পরে ছিল বাবুল মোহাম্মদ। তার বিয়া ঠিক হইছিল। বিয়ার তনে কাপড়-চোপড় কেনা ইইছিল। কিন্তু যুদ্ধ লাগি যাওয়ায় আর বিয়া হয় নাই। খানেরা অর বাপের সাথে অকও মারি ফেলাইছে।

শরণার্থী

মোঃ সৈয়দুর রহমান তুষার (৪৪)

পিতা: শহীদ আব্দুস সাত্তার, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা: বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: দিনাজপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়, ক্ষেত্রিপাড়া, দিনাজপুর। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি মাত্র দেড় বছরের শিশু ছিলাম। তাই তখনকার কোনো কিছু আমার জানা নেই। তবে মুক্তিযুদ্ধের পর

৯ম-১০ম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি বহলা গণহত্যার কথা জানতে পারি। তখন এটাও জানতে পারি যে, আমার বাবা ঐ গণহত্যায় শহীদ হয়েছেন। মা ছাড়াও আমার মামা তমিজউদ্দিন আহমেদ, আম্মার চাচাত ভাই মোঃ হামিদউল্লাহ সহ অনেকের কাছ থেকে সেই নৃশংস ঘটনার কথা জেনে আমার মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া হতো যে, মানুষ এত নিষ্ঠুরভাবে কেমন করে মানুষকে হত্যা করতে পারে?

আমি আমার বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলাম। আমার বড় বোন হাসানে বানুর বয়স তখন মাত্র ৮ বছর ছিল। এই দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার অবর্তমানে আমার মা অনেক কষ্টে আমাদেরকে মানুষ করেছেন। কিন্তু শহীদের সন্তান হিসেবে আমরা সরকারের কোনো সুযোগ-সুবিধা পাইনি। সরকারের প্রতি আমার আবেদন হলো, সরকার মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সন্তানদেরকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন সেভাবেই বহলাসহ সকল গণহত্যায় শহীদদের উপযুক্ত মর্যাদা এবং তাদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের যেন সুযোগ-সুবিধাদি দেয়া হয়।

মোঃ সৈয়দুর রহমান তুষার

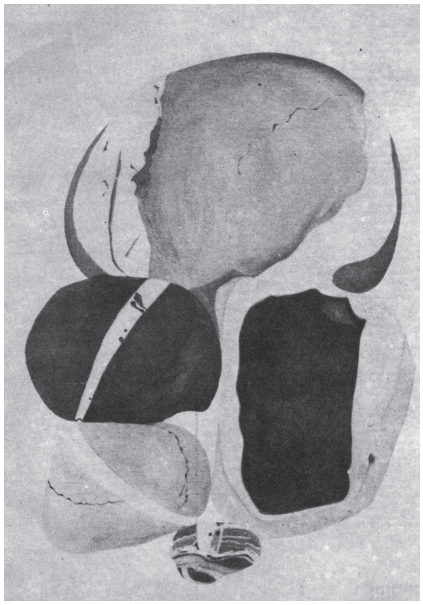

মুর্তজা বশীর
শহীদ শিরোনাম
তেল রং, ১৯৭৬

আহতদের মৌখিক ভাষ্য

আনিসুর রহমান বাবুল (৫৯)

পিতা: হবিবর রহমান, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ক্লাস সিক্সে পড়তাম। বয়স ছিল ১৬। ১৩ ডিসেম্বর বিকেলের দিকে প্রায় ৩০-৪০ জন পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের গ্রামে ঢুকল। কিছু পরে আরো ৩০-৪০জন পাকিস্তানি বাহিনী হেঁটে আমাদের গ্রামে ঢোকে। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে

আমাদেরকে বলে গ্রাম ছেড়ে দাও, আমরা এখানে ক্যাম্প করব। ঐ সময় আমি বাড়িতেই ছিলাম। আমার আব্বা, আম্মা সবাই বাড়িতেই ছিল। পাক সেনারা আমাদেরকে বাইরে বের হতে বললে কিছু খাবার, কাপড়-চোপড় একটি ভারে নিয়ে আমি বাড়ি থেকে বের হই। আমার আব্বা বলে, তুই আগা হামরা যাছি।' আমি ভার নিয়ে বাইরের খোলানে আসতেই পাক সেনারা আমার ভারটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল এবং গালে জোড়ে একটা চড় দিয়ে লাইনে বসিয়ে দিল। আমি দেখি আরো ৭-৮ জনকে লাইনে বসানো হয়েছে। এভাবে দেখি লোকজনকে লাইনে আনতেই আছে, বসাতেই আছে। যাদেরকে লাইনে এনে বসায় তাদের প্রায় সকলে আমার চেয়ে বয়সে বড়। তবে আমার চেয়েও কম বয়সের একজন ছিল যার নাম আব্দুল করিম, পিতা আজিরউদ্দীন। তার বয়স ১৩ বছরের মতো ছিল। অন্যদের বয়স ৩০-৪০ এর মধ্যে ছিল। কয়েকজন ছিল ৫০-৫৫ বছর বয়সী। পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের সবাইকে ঘেরাও করে রেখেছিল। এই অবস্থাতেই সেখানে অনেকে মাগরিবের নামাজ পড়ে। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী বলে তুমলোক উঠকে দাঁড়াও। তারপর সবাইকে এক-দেড়শ' ফুট হাঁকায় নিয়ে যেখানে বহলার বধ্যভূমি ও শহীদ মিনার আছে সেখানে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর বলে 'ব্যায়থো।' আর ব্যায়থো বলার সাথে সাথেই ব্রাশফায়ার শুরু করে। এসময় আমি উল্টে পেছন দিকে পড়ে যাই। গুলি লাগায় আমার উপরে আরো ২-৩জন পড়ে যায়।

তখনো আমাকে গুলি লাগে নাই। আমি তখন লাশচাপা হয়ে আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকি। তারপর পাকিস্তানি বাহিনী ও কিছু বিহারি আমাদের লাশের ঢিপটাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিয়ে লাশগুলোকেই গুলি করতে থাকে। তখন আমারো পেছন দিকে একটা গুলি লাগে। গুলি লাগার পরও আমার চেতনা ছিল।

আনিসুর রহমান বাবুল

রেজাউল করিম
গণহত্যা-৪
ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
২০১২

পাকিস্তানি বাহিনী চলে যাওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারিনি। আমি লাশের ধারে সারা রাত পড়ে থাকি।

গণহত্যার পরদিন ফজরের নামাজের পর পাকিস্তানি বাহিনী আবার লাশের জায়গায় এসে লাশের উপর খড় চাপা দেয়। আমার দেহ লাশগুলোর সাইডে ছিল। পাক বাহিনী আমাকে হাত দিয়ে তুলে নিয়ে লাশের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তারপর খরচাপা দেয়। তখন আমিও খড় দিয়ে ঢাকা পড়ি। জ্ঞান থাকায় সেটা আমি বুঝতেও পারি। লাশের উপরে খর চাপা অবস্থায় সকাল প্রায় ১০টার দিকে আমার প্রতিবেশি সম্পর্কের এক চাচা তমিজউদ্দীনকে দেখতে পাই। তিনি ঐদিক দিয়ে পালাচ্ছিলেন। তাকে দেখে হাত ইশারায় ডাক দেই। কিন্তু তিনি আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যান। আমার কাছে না এলেও তিনি পলাশবাড়ি গ্রামে পালিয়ে থাকা আমার বাবাকে খবর দেন। কিন্তু আমার বাবা সম্ভবত নিরাপত্তা বা অন্য কোনো কারণে সেদিন আসেন নাই।

এদিকে পুরোদিন ও আরেকটি রাত আমি লাশের উপরেই পড়ে থাকি। অনেকবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হই। দ্বিতীয় রাত কাটিয়ে ফজর নামাজের পর আমি হামাগুড়ি দিতে দিতে কোনো রকমে আমাদের বাড়িতে আসি। দেখি বাড়ি ফাঁকা। শুধু গরুগুলো বাঁধা ছিল। গরুগুলো আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। আমি ঐ অবস্থাতেই কোনোরকমে গরুগুলো ছেড়ে দেই। তারপর গোয়াল ঘরে কোনোরকমে খড় বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর মনে হলো আবার বোধহয় পাকিস্তানি বাহিনী এসেছে। পরে বুঝলাম মনের ভুল। যদি সত্যিই আসত তাহলেও পালানোর মতো শক্তি আমার ছিল না। আমি শক্তিহীনভাবে অনেকটা অচেতনের মতো গোয়াল ঘরে শুয়ে থাকি। এভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়। শেষ বিকেলের দিকে আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। তখন আমি আবার দেয়াল ধরে খাড়া হওয়ার চেষ্টা করলাম। আর তখুনি দেখি আমার বাবা ও আরো দুজন লোক যাদের একজনের নাম রমজান আলী, তারাসহ আমাদের বাড়িতে ঢুকলেন। তারা আমাকে ঘাড়ে করে পলাশবাড়ি নিয়ে গেলেন। পরদিন ভারে করে নিয়ে গেলেন মুক্তিযোদ্ধাদের হামজাপুর ক্যাম্পে। সেখানে চিকিৎসা নিয়ে আমি ভালো হই। আমার পিঠের মাঝখানে গুলি লাগার জায়গাটি টিউমারের মতো ফুলে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গুলি ছিল এটা বুঝতে পারিনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার ১০-১২ বছর পর সেই ফোলা জায়গাটা অপারেশন করতে গিয়ে গুলি বেরিয়ে আসে।

মোঃ মতিয়ার রহমান (৫৯)

পিতা: শহীদ ইসাহাক আলী, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

হামিদুজ্জামান খান
'৭১-এর স্মরণে
ভাস্কর্য, ব্রোঞ্জ

যখন ৭ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম তখন মুক্তিযুদ্ধের শুরু। আমাদের গ্রামের পাশে কোকইডাঙ্গা নামের একটা জায়গা আছে। কোকইডাঙ্গার সাথেই পুনর্ভবা নদী। পুনর্ভবা নদীর পরে ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার বা কুঠিবাড়ি।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে কুঠিবাড়িতে ব্যাপক গোলাগুলি শুরু হয়। এ সময় আমাদের গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে কুঠিবাড়ির দিকে ছুটে যায়। ২৮ মার্চ কুঠিবাড়ি বাঙালিদের দখলে এলে সেখানকার সমস্ত মালামাল, অস্ত্র, গুলির বাক্স আমাদের গ্রামে নিয়ে এনে রাখা হয়। আমাদের পুরো গ্রাম কুঠিবাড়িতে ভেঙ্গে যায় এবং সেখানকার মালামাল বয়ে আনে। আমিও তখন আমাদের গ্রামের লোকজনের ভিড়ে কোকইডাঙ্গা পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলাম কিন্তু ছোট থাকায় কিছু আনিনি। আমি শুধু দেখেছি হাজার হাজার লোক পুনর্ভবা নদী পেরিয়ে কুঠিবাড়ির দিকে যাচ্ছে আর আসছে।

মোঃ মতিয়ার রহমান

প্রায় ৪০-৫০ বাক্স গুলি, পিস্তলের বাক্স, মর্টারসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ আমাদের গ্রামে একটি বিলের ধারে এনে রাখা হয়েছিল। সারাদিন ধরে লোকজন এগুলো নিয়ে এসে ঢিপ করে রাখে, রাতেই ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।

কুঠিবাড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসায় বাঙালিরা ভালোই ছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দিনাজপুর শহর আবার পাকিস্তানি বাহিনী দখল করে নেয়। ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে দিনাজপুর জেলার পতন হলে শহরের লোকজন আমাদের

গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু পাকিস্তানি সেনা ও বিহারিরা যাকে তাকে গুলি করা, বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটাতে থাকে। হত্যা, নির্যাতন ব্যাপক হারে বেড়ে গেলে লোকজন বহলা থেকেও পালিয়ে যেতে থাকে।

এসময় আমরাও পুরো পরিবার ও গ্রামবাসী পালিয়ে যাই। আমরা বিরলের হরিপুর, পলাশবাড়ি, জগতপুর, কালিয়াগঞ্জ হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের দুই-তিন মাইল ভিতরে বাঁশকুড়ি গ্রামের একটি স্কুলে আশ্রয় নিই। সেখানে ২-৩ দিন থাকার পর কাঁটাবাড়ি হাটের দক্ষিণ দিকে হোসেনপুর গ্রামের একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়িতে উঠি। এখানে দুই-তিন মাস থাকি।

দেশে শান্তি ফিরে এসেছে, পাকিস্তানি বাহিনী আর কাউকে মারে না এমন সংবাদ পেয়ে আমরা ২-৩মাস পর আবার বহলায় ফিরে আসি। আসার পর প্রথম দিকে তেমন সমস্যা হয়নি। শুধুমাত্র মাঝে মাঝে রেললাইন পাহারা দেয়া, বাংকার খুঁড়ে দেয়ার জন্য রাজাকাররা আমাদের বাপ, চাচাসহ গ্রামবাসীকে কখনো কখনো নিয়ে যেত। কখনো কখনো আমাদের গ্রাম থেকে খাসি, মুরগী, গরু, ছাগল ধরে নিয়ে যেত। কখনো কখনো এসে জিজ্ঞাসা করত মুক্তি কিধার হ্যায়? হিন্দু কিধার হ্যায়? গ্রামের লোক সব সময়ই বলত জানি না। তখন রাজাকাররা বলত, মুক্তি এলে যেন খবর দেই।

মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝেই আমাদের গ্রামে আসত। তাদেরকে ভাত, মুড়ি, চালভাজা খাওয়াতাম। কোথায় পাক সেনা আছে, কোথায় বাংকার আছে, কোথায় পাহারা চলছে এইসব খবর তাদেরকে দিতাম। তখন পরিস্থিতিটা এমন ছিল যে, ছোট বাচ্চারাও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ছিল। পাক বাহিনী কিংবা রাজাকাররা বাচ্চাদের কাছ থেকেও মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতে পারত না। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান, গতিবিধি সম্পর্কে সকল তথ্য বাচ্চারাও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দিত।

এভাবেই আমরা চলছিলাম। তেমন বড় ধরনের সমস্যা হচ্ছিল না। কিন্তু সমস্যা হলো দেশ স্বাধীন হওয়ার ২-৩ দিন আগে। তখন উত্তর বহলার সাঁতাহার থেকে অনেক বাঙালি পাক সেনাদের ভয়ে আমাদের দক্ষিণ বহলায় এসে উঠেছিলেন। তারা আমাদের গ্রামটাকে নিরাপদ মনে করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের একেবারেই শেষের দিকে এসে নিরাপদ আর থাকল না।

১৩ ডিসেম্বর সোমবার বিকাল ৫টা-সাড়ে ৫টার দিকে কালো পোশাকের আলবদর, আর মাটিয়া পোশাকের পাক সেনারা আমাদের গ্রামটাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরলো। তারা গ্রামের

প্রত্যেকটা বাড়িতে সার্চ করে করে সব মানুষকে ধরে ধরে এনে এক জায়গায় জড়ো করলো। আমাকে, আমার বাবাকে, চাচাকে সহ সব লোককে ধরে এক সাথে ব্রাশফায়ার করলো। ব্রাশফায়ারের সাথে সাথে বেশিরভাগ মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল। যারা আহত হয়ে উহু, আহা করছিল তাদেরকে চেক করে আবারো তাদের উপর গুলি চালাল।

ব্রাশফায়ারের সাথে সাথে কেউ কেউ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। আমিও পালানোর জন্য দৌড় দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাম পা পার করে ডান পা যখন আইলের উপরে নিয়ে এসেছি তখুনি ডান উড়ুতে একটা গুলি এসে লাগে আর অন্যান্য লাশের মধ্যে পড়ে যাই। গুলি লাগলেও আমার জ্ঞাণ ছিল। আমি চুপচাপ পড়ে থাকি। পাক সেনারা যখন আবারো পড়ে থাকা দেহগুলো বেঁচে আছে কি না বোঝার জন্য সার্চ করছিল তখন তারা আমার দেহে একটা লাথি মারে। তখন আমি কৌশল করে আমার গুলি লাগা পা'টিকে উপুড় করি। রক্তমাখা পা দেখে পাকিস্তানি বাহিনী বোধহয় ধরে নিয়েছিল আমি মরে গেছি। তারা আমাকে গুলি না করেই চলে যায়। পাকিস্তানি বাহিনী চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত রক্তাক্ত, মৃত মানুষের ঢিপের মধ্যে ছিলাম। মানুষের রক্ত কত গরম সেটা সেদিন অনুভব করেছিলাম। মানুষের রক্ত সেদিন এরকম মনে হয়েছিল যেন চায়ের পানির মতো আমার শরীরে তাপ দিচ্ছিল।

পাক সেনা ও আলবদররা চলে যাবার পর আমি উঠে দাঁড়াই। আমি আস্তে আস্তে করে আমার আব্বাকে কয়েকবার ডাকি। কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে বুঝে ফেলি যে তিনি বেঁচে নেই। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ঐ অবস্থায় আমি নেংড়ায় নেংড়ায় দক্ষিণ দিকে হাঁটতে থাকি। কষ্ট হচ্ছিল। তবু জান বাঁচানোর জন্য মাইলখানেক হেঁটে মানপুরে যাই। সেখানে একটি বাড়িতে ঢুকি। কিন্তু পুরো বাড়ি ফাঁকা। আমার আর হাঁটবার শক্তি ছিল না। তাই নির্জন ও অন্ধকার বাড়ির বারান্দায় শুয়ে পড়ি এবং একা একাই রাত কাটিয়ে দেই। আমার মামা শাহাজুদ্দিন আহমেদ (শাহাজুদ্দিন আহমেদ, পিতা মৃত খাতির মোহাম্মদ, সাং-হরিপুর, বিরল) পরদিন খবর পেয়ে ঐ বাড়িতে আসেন এবং আমাকে ঘাড়ে তুলে ভারতের হামজাপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে নিয়ে যান। সেখানে ১৩ দিন চিকিৎসার পর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গাড়িতে করে আমাকে দিনাজপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মহারাজা স্কুলে মাইন বিস্ফোরণের ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। ১৯৭২ সালের ৬ই জানুয়ারির ঐ ঘটনার পর প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আমি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে বাড়িতে চলে আসি।

মোঃ মহিরউদ্দিন (৬০)

পিতা: মৃত আছিরউদ্দিন, গ্রাম : সাঁতাহার উত্তর বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি ৬ জানুয়ারি ২০১৫

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে বাবা, ভাই, বোনসহ আমরা সাঁতাহারপাড়া ছেড়ে বহলায় বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান আমজাদ আলীর বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঘটনার দিন সোমবার বিকাল বেলা পাক সেনারা এসে আমাদের সবাইকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে এই কথা বলে যে, তারা এখানে ক্যাম্প করবে। আমরা ঘরের মালামাল নিয়ে সরে যেতে চাইলে পাক সেনারা বাধা দেয়। তারা সব পুরুষদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে সন্ধ্যায় ব্রাশফায়ার করে। বর্তমান চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনেই তারা ব্রাশফায়ার করে। আমার বাবা মোঃ আছিরউদ্দিন, দুই ভাই আব্দুল রহমান ও সফি মোহাম্মদ ঐ ব্রাশফায়ারে মারা যায়। আমার পিঠে গুলি লাগলে আমি প্রায় মরার মতো লাশের ঢিপির উপর পড়েছিলাম। পাক সেনারা চলে যাওয়ার পর আমার মা দয়ারন বেওয়া আমাকে হাত ধরে টেনে তোলেন। তারপর চিকিৎসা ও অপারেশনে বেঁচে যাই।

আইরিন হামিদ
বয়স ১১
রায়ের বাজার বধ্যভূমি
জল রং, ১৯৮৭

মোঃ মহিরউদ্দিন (৫৮)

পিতা: ইমান আলী, গ্রাম : সাঁতাহার উত্তর বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি ৬ জানুয়ারি ২০১৫

আমি এবং আমার নামের আরো এক মহিরউদ্দিন। আমরা দুজনেই বহলার ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলাম। আমার পিঠের মেরুদণ্ডে গুলি লেগেছিল। একটি গুলি এখনো আমার পিঠে

মোঃ মহিরউদ্দিন

আছেই। ভারি কাজ করলে এবং বেশি সাইকেল চালালে এখনো পিঠ ব্যথা করে।

নাজলি লাইলা মনসুর
১৯৭১
মিশ্র মাধ্যম, ১৯৯৩

মোঃ নজরুল ইসলাম কড়ি (৭১)

পিতা: কাঞ্চিয়া মোহাম্মদ, গ্রাম : সাঁতাহার উত্তর বহলা, ডাক: কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৬ জানুয়ারী ২০১৫

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স প্রায় ৩০-এর মতো ছিল। বহলার কছিমুদ্দিন আমার সম্বন্ধী ছিলেন। তার বাড়িটাই ছিল শ্বশুরবাড়ি। আমার পাড়ায় পাক সেনাদের বেশি আনাগোনার কারণে তিন সন্তান, স্ত্রী এবং আমার ছোট ভাই মোঃ খতিবুদ্দিনকে নিয়ে সাঁতাহার ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানেও বিপদে পড়ি। ঘটনার দিন আমাদেরকে ধরতে প্রথমে দুইজন পাকিস্তানি বাহিনী শ্বশুরবাড়িতে ঢোকে। তাদেরকে দূর থেকে দেখে আমি আমার ছোট ভাইকে বলি, তুই একজনাক ধরিবু, মুই একজনাক ধরিম, দুজনকেই মারি দিমো। তখন আমার কাছে ধারালো অস্ত্র লুকানো ছিল। আমরা যখন দুই খান সেনার উপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছি তখুনি আরো ৪-৫ জন সেনা এসে যায়। তখন আর কিছু করতে পারি নাই।

মোঃ নজরুল ইসলাম কড়ি

আমাকে, আমার ছোট ভাই, সম্বন্ধীসহ প্রায় এক-দেড়শ' ছেলে মানুষকে পাক সেনারা ধরে নিয়ে গিয়ে একটি খোলানে বসিয়ে রাখে। সবাই বসে ছিলাম। তারপর আমাদেরকে উঠতে বলে। আমরা যখন খাড়া হয়ে উঠতেছি তখন আমাদেরকে মাঝখানে রেখে পাক সেনারা পেছাতে থাকে। যখন আমাদের সাথে পাক সেনাদের একটা ফাঁক তৈরি হয় তখন তারা চতুর্দিক থেকে আমাদেরকে গুলি করে। গুলির সময় আমি শুয়ে পড়ি।

আমার উপর অনেকগুলো লাশ পড়ে। লাশ চাপা থাকলেও প্রথমে আমাকে গুলি লাগে নাই। কিন্তু আমার পাশে ফকিরবুড়া নামের একজন বয়স্ক লোক গুলিবিদ্ধ অবস্থায় 'পানি খাম পানি খাম' বলে চিৎকার করতে থাকে। তখুনি পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের দিকে আবার গুলি বর্ষণ করে। আর ঐ সময়েই আমার ডান পায়ের গোড়ালিতে ৩টি গুলি লাগে।

গুলি লাগলেও জ্ঞান ছিল। পাক সেনারা চলে যাওয়ার পর কিছু মহিলা সেখানে যায়। তারা লাশ ঘুটকে ঘুটকে দেখতে থাকে। তখন একজন মহিলাকে বলি আমাকে তোলার জন্য। তিনি আমাকে লাশের ভেতর থেকে টেনে তোলেন এবং তার শাড়ি দিয়ে আমার মুখে লেগে থাকা রক্ত মুছে দেন। আমি হাঁটতে পারছিলাম না। সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আমি আড়াই-তিন মাইল দূরে মানপুর গ্রামের একটি মসজিদে ঢুকে পড়ি। তখন একজন লোক আমাকে দেখতে পেয়ে পাশের একটি বাড়িতে ঢুকিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পরদিন আমার আত্মীয়রা আমাকে সেখান থেকে বাংলাদেশের শেষ সীমান্ত বৈদ্যনাথপুরে নিয়ে যায়। এর পরদিন নিয়ে যাওয়া হয় ভারতের হামজাপুরে। প্রফেসর ইউসুফ আলী সেখান থেকে আমাকে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেন। আমাকে যে ৩টি গুলি লেগেছিল তার ১টি পায়ের গোড়ালির একদিক দিয়ে ঢুকে আরেকদিক দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। দুইটি গুলি পায়ের মধ্যে থেকেই গিয়েছিল। সেগুলো অপারেশনের মাধ্যমে বের করে দেয়। তবে পায়ের ব্যথা এখনো আছে। এখনো ব্যথা নিরাময়ের জন্য আমাকে ঔষধ খেতে হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য

মোঃ শফিউদ্দিন (৭২)

পিতা: ততি মোহাম্মদ, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর।
সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আমার পিতার নাম ততি মোহাম্মদ, শ্বশুরের নাম নতি মোহাম্মদ। আমার জন্মস্থান বিরলের রবিপুরে। বহলা আমার শ্বশুরবাড়ি। মুক্তিযুদ্ধকালে শ্বশুরবাড়ি থাকতাম আর দিনমজুরী করে চলতাম। ১৩ ডিসেম্বর সোমবার । সেদিন আমি সকাল বেলা বহলার দক্ষিণ সাইডে ধান কাটছিলাম। সেদিনেই কুঠিবাড়ি থেকে পশ্চিম দিক গোশের ডাঙ্গার ঐদিকে ব্যাপক হারে বোম

পড়তেছিল। বহলা থেকে বোমের চলকাত চলকাত আলো আর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল, বোম পড়ার শব্দও পাচ্ছিলাম। আমি যেখানে ধান কাটছিলাম সেখানে আমার সম্বন্ধী সামির মোহাম্মদ ছিল। তাকে বলি যে, 'আইজকা ধান কাটা যাবে নাই। আইজকা মনে হছে লোকজনক মারি ফেলাইবে। চল পালাই।' আমার সম্বন্ধী বলে, 'ধুর পাগল, কিছুই হবে না।'

দুপুরে বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে সম্বন্ধীর ছোট ভাই আমার শ্যালক সহ একবার উত্তর দিকে ধান বান্ধে উভায় নিয়ে আসি। এরপর আবার যখন ধান আনতে যাই তখন দেখি দক্ষিণ দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা উত্তর দিকে পাকিস্তানি বাহিনীর দিকে বোমা মেরেছে। তখন উত্তর দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের পজেশন নিতে নিতে আমদের গ্রামের দিকে আসতে দেখি। তখন আমার শ্যালকসহ আমি একখান গাছের গোড়ায় গিয়ে লুকাই। অনেকক্ষণ লুকাই থাকি এক পর্যায়ে আমি বলি, এভাবে লুকায় থাকলে পাকিস্তানি বাহিনী আমাদেরকে দেখে ফেলবে এবং মুক্তিযোদ্ধা মনে করবে। তখন বিপদ বেড়ে যাবে। তার চেয়ে পালাই। এরপর পালিয়ে বাড়িতে আসি। বাড়িতে আমার শ্বশুর ছিল। ঐ মুহূর্তে আমার এক চাচাত সম্বন্ধী আমার শ্বশুরকে বলে, 'চাচা পাক সেনারা ইখান থাকি পালাবার তনে পাঁচ মিনিট সময় দিছে। এর মধ্যে না পালালে সবাইকে মারি ফেলবি।' ছামির, আমিনুল এখান থেকে পালাবার জন্য টোপলা-টুপলি বাঁধতে থাকল। তখন আমি বলি, 'ছামিরদা আমি সকাল থেকে তোমাকে বলছিলাম, কিন্তু আমার কথা তো শুনলে না। এখন কি অবস্থা?' আমি খুব ভয় পাইছিলাম। একথা বলার পর আমি সার্ট পরে ঐ ঘরে খাটের তলে ঢুকি। ঐ ঘরে আমিনুলের ৪-৫ বছর বয়সী এক মেয়ে ছিল। তাকে বলি, বেটি কাউকে বলিস না। কেউ আসি জিজ্ঞাসা কইরলে বলবি নাই।

শ্যামল বিশ্বাস
বয়স ১১
মুক্তিযোদ্ধা ও হানাদার বাহিনী
জল রং, ১৯৮৭

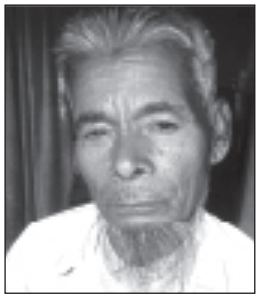

মোঃ শফিউদ্দিন

আমি খাটের তলায় লুকিয়ে থাকি। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী অন্য পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে যায়। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। খাটের তলায় কেউ লুকিয়ে আছে কি না তা দেখার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে চৌকির তলা দেখে নিচ্ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি যেই ঘরে লুকিয়েছিলাম তারা সেই রুমে আসে নাই। পাক বাহিনী পুরুষ মানুষদের ধরে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আমি ঐ ঘরের তালায় উঠি। তালার উপরে উঠে দেখতে পাই ধরে নিয়ে যাওয়া সমস্ত লোককে একটি খোলানে গোল করে রেখে পাকিস্তানি বাহিনী তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। আমার সম্বন্ধী সামিরের বয়স ৪০-৪৫ এর মতো ছিল। তিনি নামাজি লোক ছিলেন। পরে শুনেছি যে, সামির মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য পাক বাহিনীর কাছ থেকে সময় চায়। তারা এইটুকু অনুরোধ রাখেন। এ সময় অনেকেই নামাজ পড়ে নেয়। নামাজ পড়ার পর একটু অন্ধকার দেখা দেয়। আর তখুনি পাকিস্তানি বাহিনী তাদেরকে গুলি করে। আমি চালার উপর থেকে দেখি, যেই রকম খইমুড়ি ফটফট করে ভাজে সেই রকম শব্দে এলএমজি দিয়ে এক নিমিষে সব লোকগুলোকে মেরে দিল। এদের মধ্যে কিছু লোক আহত হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। গড়াগড়ি খাওয়া লোকগুলোর হাত ধরে পা ধরে টেনে হিঁচড়ে এক জায়গায় করে আবার তাদেরকে এলএমজি ফায়ার করে। এই রকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখেও নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য তালার উপর চুপ করেছিলাম। ঠাণ্ডা লাগছিল, মশায় কামড়াচ্ছিল তবুও আমি চুপ করে ছিলাম। পরে রাত প্রায় ১টার দিকে তালা থেকে নেমে কারো খবরা-খবর না নিয়ে আমি আমার নিজের বাড়িতে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি বাড়িতে কেউ নাই। বাড়ির গোয়াল ঘরে বসে আধা ঘণ্টার মতো ভাবতে থাকলাম যে কি করব। কিন্তু কিছুই ভাবতে পারলাম না। বাইরে বের হবার সাহস আমার হলো না। তখন আমার বাড়ির কোঠার ঘরের তালায় উঠে চুপচাপ একা বসে থাকলাম। এরপর ভোর ৫টার দিকে দেখি আমার স্ত্রী লুৎফা খাতুন বাড়িতে ঢুকছে। সে বাড়িতে ঢুকে পানির কলসী থেকে পানি ঢালে আর খায়, আবার পানি ঢালে আবার খায়। তার ভেতর পানির এত তৃষ্ণা এর আগে কখনো দেখিনি। আমি তালার উপর থেকে বউয়ের নাম ধরে ডাকি। কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছিল না। তখন আমি বউয়ের দিকে ঢিল মারি। বউয়ের পায়ে ঢিল লাগলে সে আমার দিকে তাকায়। আমাকে দেখতে পেয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বাঁশ ধরে সে তালায় উঠে আসে। সে আমাকে বলে, চলো পালাই। কিন্তু আমি তাকে বলি যে, পালাবার কোনো শক্তি আমার নাই। সাহসও নাই। তুমি পালাতে পারলে পালাও। আমি তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেই, সেও আমার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়। তারপর সে চলে যায়। আর আমি তালাতেই থাকি। পাকিস্তানি বাহিনী

সোমবার সন্ধ্যায় গণহত্যা চালানোর পর মঙ্গলবার সকালে আরো কয়েকজনকে হত্যা করে। তারা মেয়েদেরকেও হত্যা করার জন্য এক জায়গায় জড়ো করেছিল। কিন্তু কাঞ্চন ক্যাম্প থেকে একজন মেজর এসে মেয়েদেরকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমার পালানোর সাহস ছিল না। ঘরের তালার উপরে খড়ির ঢিপের মধ্যে না খেয়ে না দেয়ে শক্তি-সাহসহীন অবস্থায় আমি পড়ে থাকি। মঙ্গলবার রাত গিয়ে বুধবার বিকাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। বুধবার শেষ বিকালে আমার আপন সম্বন্ধী কলিমুদ্দিন মোহাম্মদ, পিতা নতি মোহাম্মদ আমার স্ত্রীর কাছ থেকে খবর পেয়ে আমাকে নেয়ার জন্য আসে। আমার নাম ধরে ডাকে। কিন্তু প্রথমেই নামার সাহস হচ্ছিল না। এরপর গলা চিনতে পেরে নেমে আসি। তার সাথে সারেঙ্গী পলাশবাড়িতে যাই। সোমবার দুপুরে খাওয়ার পর বুধবার রাতে প্রথম সেখানে ভাত খাই।

আমজাদ হোসেন

পিতা খলিলউদ্দিন, সাং- বহলা, উপজেলা- বিরল। বিজোড়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৫ জানুয়ারী ২০১৫

১৯৭১ সালে আমার বয়স ৮-১০ বছর ছিল। ১৩ ডিসেম্বর সোমবার বেলা ডোবার আগে পাক সেনারা আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিক থেকে আসে। তারা সংখ্যায় ৫-৭ জন ছিল। আর রাজাকার আলবদরদের সংখ্যা ছিল ৬০-৭০ জন। তারা গ্রামের লোকজনকে বলে যে, "আমরা ক্যাম্প করব তোমরা সবাই ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাও।" তারা গ্রামের সব পুরুষদেরকে একত্র করে। তারা আমাকেও নিয়ে যায়। তারা মাগরিবের নামাজ পড়ার সুযোগ দেয়। নামাজ পড়ার পর তারা লোকজনকে দক্ষিণ সাইডে লাইন করায়। তখন আমার ভাইয়েরা জোরাজুরি করে ছিলেন। তারা আমাকে বলেন, তুই ছোট আছিস, চলে যা। আমি চলে আসতে চাইলে পাকিস্তানি বাহিনী আমাকে আটকে রাখার চেষ্টা করে। আমি তখন কান্নাকাটি শুরু করে দিলে তখন আসতে দেয়। আমি বাড়িতে আসার পর ঘরের জানালা দিয়ে দেখি লোকজনকে ৩টি লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে। এরপরেই তাদেরকে ব্রাশফায়ার করে। পরে আমি শুনেছিলাম যে, কে আগে গুলি করবে তা নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে কথা চালাচালি হয়। মোস্তফা নামের একজন বিহারি বলে যে, হাম আগে গোলি চালায়েঙ্গে। সে গুলি করার পর সবাই একসাথে গুলি চালায়। এই ঘটনায় আমি বেঁচে গেলেও আমার দুই ভাই শহীদ হয়।

মোঃ মনসুর আলী (৫২)

পিতা: কলিমউদ্দিন, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ইউপি চেয়ারম্যান আমজাদ আলীর বাড়ির বাইরের খোলানে, ৬ জানুয়ারি ২০১৫

আমজাদ হোসেন

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স কম ছিল। আমার বাবা তখন এই এলাকায় একজন নেতার মতো ছিলেন। আমাদের এখানে যেদিন গণহত্যা হয় সেই দিন অসংখ্য ভারতীয় বিমান আকাশ পথে উড়ে এসে বিভিন্ন জায়গায় বোম্বিং করে। সেদিন বহলার শিলকুড়ি পুকুরে, পালশাহারে, কাঞ্চন রেলস্টেশনে বোম পড়ে। বোমায় রেল সিগন্যালের পাখা ভেঙ্গে যায়। তখুনি তারা পাগল হয়ে গণহত্যার ঘটনা ঘটায়। তারা বহলা ছেড়ে যাওয়ার সময় কাঞ্চন রেল ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে যায়। গণহত্যার দিন বাচ্চাখান নামে একজন রাজাকার আমাকে আঘাত করেছিল। তার লাঠির আঘাত খেয়ে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম।

স্মৃতিরক্ষা ও সংরক্ষণের প্রয়াস

বাংলাদেশের অনেক বধ্যভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতন কেন্দ্রের মতো বহলা গণহত্যার স্থানটিও ছিল উপেক্ষিত। গণহত্যার সংখ্যা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও গণমাধ্যমে তার প্রকাশ উল্লেখযোগ্য ছিল না। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পর কয়েকটি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করলেও তা প্রচার করেনি।

মোঃ মনসুর আলী

মুক্তিযুদ্ধের পর স্থানীয় উদ্যোগে গণসমাধির চতুর্দিকে দুই ফুট উচ্চতায় প্রাচীর নির্মাণ করে গণকবরটিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। শহীদদের স্মরণে ১৯৭২ সালে 'বহলা শহীদ

ফুরকানিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা' প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্থানীয় উদ্যোগ ছাড়া আর কোনো সরকারি উদ্যোগ তখন এখানে ছিল না। তবে শহীদ সন্তানদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকারের শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর ইউসুফ আলী এখানে সরকারিভাবে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে 'বহলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারাদেশে বধ্যভূমিগুলো সংরক্ষণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর বহলা গণহত্যার জায়গাটিতে একটি স্মৃতি স্তম্ভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন দিনাজপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

মূল্যায়ন

বহলা গণহত্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, এই গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনী সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে। তাদেরকে প্রত্যক্ষ মদদ দিয়েছে আলবদর বাহিনী।

দ্বিতীয়ত, এই গণহত্যায় সেইসব পাকিস্তানি বাহিনীই অংশ নেয় যারা বহলা এবং এর আশেপাশের এলাকায় পাকিস্তানি সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পালন করছিল। তাদের কেউ কেউ ছিল গণহত্যায় নিহত ও নির্যাতিতদের পরিচিত।

মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচারকার্য বাংলাদেশে শুরু হয়েছে তার আলোকে এমন সব গণহত্যার সাথে জড়িত অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা উচিত। হয়তো সকল অপরাধীর বিচার করা যাবে না। বাছাই করে দু-একজনকে যদি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় সেটা স্বাধীন দেশের জন্য অনেক বড় অর্জন হবে। মুক্তিযুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের অন্তত সামাজিকভাবে বয়কট করা যেতে পারে। সেটাও জাতির জন্য অনেক বড় অর্জন হতে পারে।

বহলা গণহত্যায় যারা শহীদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের পর তাদের পরিবারবর্গ বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরযুক্ত একটি করে সহানুভূতি পত্র এবং দুই হজার টাকার একটি করে চেক পেয়েছেন।

আহতরাও অনুরূপ পত্র ও পাঁচ শত টাকার চেক পেয়েছেন। যারা বিধবা হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের পর তৎকালীন সরকারের দুই হাজার টাকা ব্যতীত আর কোনো সহায়তা তারা পায়নি। তারা চরমতম জীবনযুদ্ধ চালিয়ে সন্তানদের বড় করতে পারলেও অর্থনৈতিকভাবে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় নিয়ে যেতে পারেনি। বিধবাদের প্রায় সবাই সন্তানদের কথা বিবেচনায় নিয়ে আর বিয়ে করেনি। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এসে তারা অসহায় হয়ে পড়েছেন। বহলাসহ সকল গণহত্যার শিকার শহীদ পরিবারগুলোর জন্য সরকারিভাবে মাসিক সহায়তা কিংবা ভাতা বরাদ্দ থাকা দরকার। একাত্তরের ভুক্তভোগীদের পাশে সরকার এবং দেশের মানুষ থাকবেন– এটাই প্রত্যাশা বহলাবাসীর।

বহলা গণহত্যায় শহীদদের স্মরণে গড়ে ওঠা স্মৃতিসৌধ

তথ্যপঞ্জি

গ্রন্থ

মুনতাসীর মামুন (সম্পা), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, (ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০১৩)

মেহ্‌রাব আলী, *দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস*

জেলা পরিক্রমা দিনাজপুর-২, (জেলা তথ্য অফিস দিনাজপুর ১৯৮৮-৮৯)

আজহারুল আজাদ জুয়েল, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর দিনাজপুর*, (দিনাজপুর, সুবচন, ২০০২)

এম এ কাফি সরকার, *মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর* (অংকুর প্রকাশনী, ১৯৯৬)

শাহজাহান শাহ, ড. মাসুদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ : দিনাজপুর* (গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮)

ড. মোহাম্মদ সেলিম, *দিনাজপুরে মুক্তিযুদ্ধ* (সম্পাদনা- সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১)

সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা), *মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর- অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪)

সাক্ষাৎকার

মোঃ হাফিজউদ্দিন (৮৫), পিতা- মৃত মোঃ আজিজ মোল্লা গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : , বিরল, দিনাজপুর, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ : দঃ বহলার নিজ বাড়ি, ৬ জানুয়ারি ২০১৫

হামিদা খাতুন (৬২), স্বামী : শহীদ আব্দুস সাত্তার, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আয়েশা খাতুন (৭৫), স্বামী : শহীদ জয়নাল আবেদীন, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা: বিরল, জেলা : দিাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৬ জানুয়ারি ২০১৫

আব্দুল গণি, পিতা- শহীদ তসিরউদ্দিন। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: বহলা, ৬ জানুয়ারি ২০১৫

তমিজান বেওয়া (৮৫), স্বামী : শহীদ আঁখি মোহাম্মদ, গ্রাম : সাঁতাহার বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৬ জানুয়ারি ২০১৫

আনিসুর রহমান বাবুল (৫৯), পিতা: হবিবর রহমান, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মোঃ মতিয়ার রহমান (৫৯), পিতাঃ শহীদ ইসাহাক আলী, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মোঃ মহিরউদ্দিন (৬০), পিতাঃ মৃত আছিরউদ্দিন, গ্রাম : সাঁতাহার উত্তর বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি ৬ জানুয়ারি ২০১৫

মোঃ মহিরউদ্দিন (৫৮), পিতাঃ মৃত ইমান আলী, গ্রাম : সাঁতাহার উত্তর বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি ৬ জানুয়ারি ২০১৫

মোঃ নজরুল ইসলাম কড়ি (৭১), পিতাঃ মৃত কাঞ্চিয়া মোহাম্মদ, গ্রাম : সাঁতাহার উত্তর বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ৬ জানুয়ারি ২০১৫

মোঃ শফিউদ্দিন (৭২), পিতাঃ ততি মোহাম্মদ, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আমজাদ হোসেন, পিতা মৃত খলিলউদ্দিন, সাং- বহলা, উপজেলা- বিরল। বিজোড়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ৬ জানুয়ারি ২০১৫

মোঃ মনসুর আলী (৫২), পিতাঃ মৃত কলিমউদ্দিন, গ্রাম : দক্ষিণ বহলা, ডাক : কাঞ্চন, থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ ইউপি চেয়ারম্যান আমজাদ আলীর বাড়ি, ৬ জানুয়ারি ২০১৫